বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাকাল হইতে ১৩৪৭ সাল পর্যন্ত কুড়ি বৎসরের অধিককাল শান্তি-নিকেতন-আশ্রমবিদ্যালয় ও বিশ্বভারতীর আদর্শ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যেসকল বক্তৃতা দিয়াছিলেন, বিভিন্ন সাময়িক পত্র হইতে এই গ্রন্থে তাহার অধিকাংশই সংকলিত হইল। এগুলি ইতিপূর্বে কোনো পুস্তকে প্রকাশিত হয় নাই।

এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য বাংলা রচনা নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যাইবে— শিক্ষা; আশ্রমের রূপ ও বিকাশ; প্রাক্তনী; প্রতিষ্ঠাদিবসের উপদেশ ও প্রথম কার্য-প্রণালী।

এতদ্‌ব্যতীত, শান্তিনিকেতনে অধ্যাপক ও ছাত্রদিগকে আশ্রমের আদর্শ সম্বন্ধে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল হইতে আশ্রমগুরু জীবনের বিভিন্ন পর্বে যে অসংখ্য চিঠিপত্র লিখিয়াছেন তাহার কতক অংশ বিভিন্ন সাময়িক পত্রে বা গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে, অবশিষ্ট অংশ মুদ্রণ-অপেক্ষায় আছে।

বিশ্বভারতী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলিকাতা

শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়ের পঞ্চাশদ্‌বর্ষপূর্তি উপলক্ষে

প্রথম প্রকাশ : ৭ পৌষ ১৩৫৮

পুনর্‌মুদ্রণ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৭০

আষাঢ় ১৩৯৬

পুলিনবিহারী সেন -কর্তৃক সংকলিত

প্রকাশক শ্রীজগদিন্দ্র ভৌমিক

বিশ্বভারতী। ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড। কলিকাতা ১৭

মুদ্রক স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড

৫২ রাজা রামমোহন রায় সরণী। কলিকাতা ৯

॥ যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্ ॥

১

মানবসংসারে জ্ঞানালোকের দিয়ালি-উৎসব চলিতেছে। প্রত্যেক জাতি আপনার আলোটিকে বড়ো করিয়া জ্বালাইলে তবে সকলে মিলিয়া এই উৎসব সমাধা হইবে। কোনো জাতির নিজের বিশেষ প্রদীপখানি যদি ভাঙিয়া দেওয়া যায়, অথবা তাহার অস্তিত্ব ভুলাইয়া দেওয়া যায়, তবে তাহাতে সমস্ত জগতের ক্ষতি করা হয়।

এ কথা প্রমাণ হইয়া গেছে যে, ভারতবর্ষ নিজেরই মানসশক্তি দিয়া বিশ্বসমস্যা গভীরভাবে চিন্তা করিয়াছে এবং আপন বুদ্ধিতে তাহার সমাধানের চেষ্টা পাইয়াছে। সেই শিক্ষাই আমাদের দেশের পক্ষে সত্য শিক্ষা যাহাতে করিয়া আমাদের দেশের নিজের মনটিকে সত্য আহরণ করিতে এবং সত্যকে নিজের শক্তির দ্বারা প্রকাশ করিতে সক্ষম করে। পুনরাবৃত্তি করিবার শিক্ষা মনের শিক্ষা নহে, তাহা কলের দ্বারাও ঘটিতে পারে।

ভারতবর্ষ যখন নিজের শক্তিতে মনন করিয়াছে তখন তাহার মনের ঐক্য ছিল— এখন সেই মন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেছে। এখন তাহার মনের বড়ো বড়ো শাখাগুলি একটি কাণ্ডের মধ্যে নিজেদের বৃহৎ যোগ অনুভব করিতে ভুলিয়া গেছে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে এক-চেতনাসূত্রের বিচ্ছেদই সমস্ত দেহের পক্ষে সাংঘাতিক। সেইরূপ, ভারতবর্ষের যে মন আজ হিন্দু বৌদ্ধ জৈন শিখ মুসলমান খৃস্টানের মধ্যে বিভক্ত ও বিশ্লিষ্ট হইয়া আছে সে মন আপনার করিয়া কিছু গ্রহণ করিতে বা আপনার করিয়া কিছু দান করিতে পারিতেছে না। দশ আঙুলকে যুক্ত করিয়া অঞ্জলি বাঁধিতে হয়— নেবার বেলাও তাহার প্রয়োজন, দেবার বেলাও। অতএব ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থায় বৈদিক পৌরাণিক বৌদ্ধ জৈন মুসলমান প্রভৃতি সমস্ত চিত্তকে সম্মিলিত ও চিত্তসম্পদ্‌কে সংগৃহীত করিতে হইবে; এই নানা ধারা দিয়া ভারতবর্ষের মন কেমন করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে তাহা জানিতে হইবে। এইরূপ উপায়েই ভারতবর্ষ আপনার নানা বিভাগের মধ্য দিয়া আপনার সমগ্রতা উপলব্ধি করিতে পারিবে। তেমনি করিয়া আপনাকে বিস্তীর্ণ এবং সংশ্লিষ্ট করিয়া না জানিলে, যে শিক্ষা সে গ্রহণ করিবে তাহা ভিক্ষার মতো গ্রহণ করিবে। সেরূপ ভিক্ষাজীবিতায় কখনও কোনো জাতি সম্পদ্‌শালী হইতে পারে না।

দ্বিতীয় কথা এই যে, শিক্ষার প্রকৃত ক্ষেত্র সেইখানেই যেখানে বিদ্যার উদ্ভাবনা চলিতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য

কাজ বিদ্যার উৎপাদন, তাহার গৌণ কাজ সেই বিদ্যাকে দান করা। বিদ্যার ক্ষেত্রে সেই-সকল মনীষীদিগকে আহ্বান করিতে হইবে যাঁহারা নিজের শক্তি ও সাধনা -দ্বারা অনুসন্ধান আবিষ্কার ও সৃষ্টির কার্যে নিবিষ্ট আছেন। তাঁহারা যেখানেই নিজের কাজে একত্র মিলিত হইবেন সেইখানে স্বভাবতই জ্ঞানের উৎস উৎসারিত হইবে, সেই উৎসধারার নির্ঝরিণী তটেই দেশের সত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইবে। বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের নকল করিয়া হইবে না।

তৃতীয় কথা এই যে, সকল দেশেই শিক্ষার সঙ্গে দেশের সর্বাঙ্গীণ জীবনযাত্রার যোগ আছে। আমাদের দেশে কেবলমাত্র কেরানিগিরি ওকালতি ডাক্তারি ডেপুটিগিরি দারোগাগিরি মুন্সেফি প্রভৃতি ভদ্রসমাজে-প্রচলিত কয়েকটি ব্যবসায়ের সঙ্গেই আমাদের আধুনিক শিক্ষার প্রত্যক্ষ যোগ। যেখানে চাষ হইতেছে, কলুর ঘানি ও কুমারের চাক ঘুরিতেছে, সেখানে এ শিক্ষার কোনো স্পর্শও পৌছায় নাই। অন্য কোনো শিক্ষিত দেশে এমন দুর্যোগ ঘটিতে দেখা যায় না। তাহার কারণ, আমাদের নূতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি দেশের মাটির উপরে নাই, তাহা পরগাছার মতো পরদেশীয় বনস্পতির শাখায় ঝুলিতেছে। ভারতবর্ষে যদি সত্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তবে গোড়া হইতেই সে বিদ্যালয় তাহার অর্থশাস্ত্র, তাহার কৃষিতত্ত্ব, তাহার স্বাস্থ্যবিদ্যা, তাহার সমস্ত ব্যাবহারিক বিজ্ঞানকে আপন প্রতিষ্ঠা-

স্থানের চতুর্দিক্‌বর্তী পল্লীর মধ্যে প্রয়োগ করিয়া দেশের জীবনযাত্রার কেন্দ্রস্থান অধিকার করিবে। এই বিদ্যালয় উৎকৃষ্ট আদর্শে চাষ করিবে, গোপালন করিবে, কাপড় বুনিবে এবং নিজের আর্থিক সম্বল-লাভের জন্য সমবায়-প্রণালী অবলম্বন করিয়া ছাত্র শিক্ষক ও চারি দিকের অধিবাসীদের সঙ্গে জীবিকার যোগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইবে।

এইরূপ আদর্শ বিদ্যালয়কে আমি 'বিশ্বভারতী' নাম দিবার প্রস্তাব করিয়াছি।

প্র. বৈশাখ ১৩২৬

২

বর্তমান কালে আমাদের দেশের উপরে যে শক্তি, যে শাসন, যে ইচ্ছা কাজ করছে সমস্তই বাইরের দিক থেকে। সে এত প্রবল যে তাকে সম্পূর্ণ অতিক্রম করে আমরা কোনো ভাবনাও ভাবতে পারি নে। এতে করে আমাদের মনের মনীষা প্রতিদিন ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে। আমরা অন্যের ইচ্ছাকে বহন করি, অন্যের শিক্ষাকে গ্রহণ করি, অন্যের বাণীকে আবৃত্তি করি, তাতে করে প্রকৃতিস্থ হতে আমাদের বাধা দেয়। এইজন্যে মাঝে মাঝে যে চিত্তক্ষোভ উপস্থিত হয় তাতে কল্যাণের পথ থেকে আমাদের ভ্রষ্ট করে। এই অবস্থায় একদল লোক গর্হিত উপায়ে বিদ্বেষবুদ্ধিকে তৃপ্তিদান করাকেই কর্তব্য বলে মনে করে, আর-এক দল লোক চাটুকারবৃত্তি বা চরবৃত্তির দ্বারা যেমন করে হোক অপমানের অন্ন খুঁটে খাবার জন্যে রাষ্ট্রীয় আবর্জনাকুণ্ডের আশেপাশে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। এমন অবস্থায় বড়ো করে দৃষ্টি করা বা বড়ো করে সৃষ্টি করা সম্ভবপর হয় না; মানুষ অন্তরে বাহিরে অত্যন্ত ছোটো হয়ে যায়, নিজের প্রতি শ্রদ্ধা হারায়।

যে ফলের চারাগাছকে বাইরে থেকে ছাগলে মুড়িয়ে খাবার আশঙ্কা আছে সেই চারাকে বেড়ার মধ্যে রাখার দরকার হয়। সেই নিভৃত আশ্রয়ে থেকে গাছ যখন বড়ো

হয়ে ওঠে তখন সে ছাগলের নাগালের উপর উঠে যায়। প্রথম যখন আশ্রমে বিদ্যালয়-স্থাপনের সংকল্প আমার মনে আসে তখন আমি মনে করেছিলুম, ভারতবর্ষের মধ্যে এইখানে একটি বেড়া-দেওয়া স্থানে আশ্রয় নেব। সেখানে বাহ্য শক্তির দ্বারা অভিভূতির থেকে রক্ষা করে আমাদের মনকে একটু স্বাতন্ত্র্য দেবার চেষ্টা করা যাবে। সেখানে চাঞ্চল্য থেকে, রিপুর আক্রমণ থেকে মনকে মুক্ত রেখে বড়ো করে শ্রেয়ের কথা চিন্তা করব এবং সত্য করে শ্রেয়ের সাধনা করতে থাকব।

আজকাল আমরা রাষ্ট্রনৈতিক তপস্যাকেই মুক্তির তপস্যা বলে ধরে নিয়েছি। দল বেঁধে কান্নাকেই সেই তপস্যার সাধনা বলে মনে করেছিলুম। সেই বিরাট কান্নার আয়োজনে অন্য সকল কাজকর্ম বন্ধই হয়ে গিয়েছিল। এইটেতে আমি অত্যন্ত পীড়াবোধ করেছিলুম।

আমাদের দেশে চিরকাল জানি, আত্মার মুক্তি এমন একটা মুক্তি যেটা লাভ করলে সমস্ত বন্ধন তুচ্ছ হয়ে যায়। সেই মুক্তিটাই, সেই স্বার্থের বন্ধন রিপুর বন্ধন থেকে মুক্তিটাই আমাদের লক্ষ্য; সেই কথাটাকে কান দিয়ে শোনা এবং সত্য বলে জানার একটা জায়গা আমাদের থাকা চাই। এই মুক্তিটা যে কর্মহীনতা শক্তিহীনতার রূপান্তর তা নয়। এতে যে নিরাসক্তি আনে তা তামসিক নয়; তাতে মনকে অভয় করে, কর্মকে বিশুদ্ধ করে, লোভ মোহকে দূর করে দেয়।

তাই বলে এ কথা বলি নে যে, বাইরের বন্ধনে কিছুমাত্র শ্রেয় আছে; বলি নে যে, তাকে অলংকার করে গলায় জড়িয়ে রেখে দিতে হবে। সেও মন্দ, কিন্তু অন্তরে যে মুক্তি তাকে এই বন্ধন পরাভূত ও অপমানিত করতে পারে না। সেই মুক্তির তিলক ললাটে যদি পরি তা হলে রাজসিংহাসনের উপরে মাথা তুলতে পারি এবং বণিকের ভূরিসঞ্চয়কে তুচ্ছ করার অধিকার আমাদের জন্মে।

যাই হোক, আমার মনে এই কথাটি ছিল যে, পাশ্চাত্য দেশে মানুষের জীবনের একটা লক্ষ্য আছে; সেখানকার শিক্ষা দীক্ষা সেই লক্ষ্যের দিকে মানুষকে নানা রকমে বল দিচ্ছে ও পথ নির্দেশ করছে। তারই সঙ্গে সঙ্গে অবান্তর-ভাবে এই শিক্ষাদীক্ষায় অন্য দশরকম প্রয়োজনও সিদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বর্তমানে আমাদের দেশে জীবনের বড়ো লক্ষ্য আমাদের কাছে জাগ্রত হয়ে ওঠে নি, কেবলমাত্র জীবিকার লক্ষ্যই বড়ো হয়ে উঠল।

জীবিকার লক্ষ্য শুধু কেবল অভাবকে নিয়ে, প্রয়োজনকে নিয়ে; কিন্তু জীবনের লক্ষ্য পরিপূর্ণতাকে নিয়ে— সকল প্রয়োজনের উপরে সে। এই পরিপূর্ণতার আদর্শ সম্বন্ধে য়ুরোপের সঙ্গে আমাদের মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু কোনো-একটা আদর্শ আছে যা কেবল পেট ভরাবার না, টাকা করবার না, এ কথা যদি না মানি তা হলে নিতান্ত ছোটো হয়ে যাই।

এই কথাটা মানব, মানতে শেখাব, এই মনে করেই

এখানে প্রথমে বিদ্যালয়ের পত্তন করেছিলুম। তার প্রথম সোপান হচ্ছে বাইরে নানাপ্রকার চিত্তবিক্ষেপ থেকে সরিয়ে এনে মনকে শান্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা। সেইজন্যে এই শান্তির ক্ষেত্রে এসে আমরা আসন গ্রহণ করলুম।

আজ এখানে যাঁরা উপস্থিত আছেন তাঁদের অনেকেই এর আরম্ভ-কালের অবস্থাটা দেখেন নি। তখন আর যাই হোক, এর মধ্যে ইস্কুলের গন্ধ ছিল না বললেই হয়। এখানে যে আহ্বানটি সবচেয়ে বড়ো ছিল সে হচ্ছে বিশ্বপ্রকৃতির আহ্বান, ইস্কুলমাস্টারের আহ্বান নয়। ছাত্রদের সঙ্গে তখন বেতনের কোনো সম্বন্ধ ছিল না, এমন-কি বিছানা তৈজসপত্র প্রভৃতি সমস্ত আমাকেই জোগাতে হত।

কিন্তু আধুনিক কালে এত উজান-পথে চলা সম্ভবপর নয়। কোনো-একটা ব্যবস্থা যদি এক জায়গায় থাকে এবং সমাজের অন্য জায়গায় তার কোনো সামঞ্জস্যই না থাকে তা হলে তাতে ক্ষতি হয় এবং সেটা টিকতে পারে না। সেইজন্যে এই বিদ্যালয়ের আকৃতি প্রকৃতি তখনকার চেয়ে এখন অনেক বদল হয়ে এসেছে। কিন্তু হলেও, সেই মূল জিনিসটা আছে। এখানে বালকেরা যতদূর সম্ভব মুক্তির স্বাদ পায়। আমাদের বাহ্য মুক্তির লীলাক্ষেত্র হচ্ছে বিশ্বপ্রকৃতি, সেই ক্ষেত্র এখানে প্রশস্ত।

তার পরে ইচ্ছা ছিল, এখানে শিক্ষার ভিতর দিয়ে ছেলেদের মনের দাসত্ব মোচন করব। কিন্তু শিক্ষাপ্রণালী

যে জালে আমাদের দেশকে আপাদমস্তক বেঁধে ফেলেছে, তার থেকে একেবারে বেরিয়ে আসা শক্ত। দেশে বিদেশে শিক্ষার যে-সব সিংহদ্বার আছে আমাদের বিদ্যালয়ের পথ যদি সেই দিকে পৌঁছে না দেয়, তা হলে কী জানি কী হয়, এই ভয়টা মনের ভিতর ছিল। পুরোপুরি সাহস করে উঠতে পারি নি, বিশেষত আমার শক্তিও যৎসামান্য, অভিজ্ঞতাও তদ্রূপ। সেইজন্যে এখানকার বিদ্যালয়টি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হয়েছিল। সেই গণ্ডিটুকুর মধ্যে যতটা পারি স্বাতন্ত্র্য রাখতে চেষ্টা করেছি। এই কারণেই আমাদের বিদ্যালয়কে বিশ্ববিদ্যালয়ের শাসনাধীনে আনতে পারি নি।

পূর্বেই বলেছি, সকল বড়ো দেশেই বিদ্যাশিক্ষার নিম্নতর লক্ষ্য ব্যাবহারিক সুযোগ-লাভ, উচ্চতর লক্ষ্য মানবজীবনের পূর্ণতা-সাধন। এই লক্ষ্য হতেই বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক উৎপত্তি। আমাদের দেশের আধুনিক বিদ্যালয়গুলির সেই স্বাভাবিক উৎপত্তি নেই। বিদেশী বণিক ও রাজা তাঁদের সংকীর্ণ প্রয়োজন-সাধনের জন্য বাইরে থেকে এই বিদ্যালয়গুলি এখানে স্থাপন করেছিলেন। এমন-কি তখনকার কোনো কোনো পুরনো দপ্তরে দেখা যায়, প্রয়োজনের পরিমাণ ছাপিয়ে শিক্ষাদানের জন্যে শিক্ষককে কর্তৃপক্ষ তিরস্কার করেছেন।

তার পরে যদিচ অনেক বদল হয়ে এসেছে, তবু কৃপণ প্রয়োজনের দাসত্বের দাগা আমাদের দেশের সরকারি

শিক্ষার কপালে-পিঠে এখনও অঙ্কিত আছে। আমাদের অভাবের সঙ্গে অন্নচিন্তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে বলেই এই বিদ্যাশিক্ষাকে যেমন করে হোক বহন করে চলেছি। এই ভয়ংকর জবর্দস্তি আছে বলেই শিক্ষাপ্রণালীতে আমরা স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করতে পারছি নে।

এই শিক্ষাপ্রণালীর সকলের চেয়ে সাংঘাতিক দোষ এই যে, এতে গোড়া থেকে ধরে নেওয়া হয়েছে যে আমরা নিঃস্ব। যা-কিছু সমস্তই আমাদের বাইরে থেকে নিতে হবে— আমাদের নিজের ঘরে শিক্ষার পৈতৃক মূলধন যেন কানাকড়ি নেই। এতে কেবল যে শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকে তা নয়, আমাদের মনে একটা নিঃস্ব-ভাব জন্মায়। আত্মাভিমানের তাড়নায় যদি-বা মাঝে মাঝে সেই ভাবটাকে ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করি, তা হলেও, সেটাও কেমনতরো বেসুরো রকম আস্ফালনে আত্মপ্রকাশ করে। আজকালকার দিনে এই আস্ফালনে আমাদের আন্তরিক দীনতা কিছুই ঘোচে নি, কেবল সেই দীনতাটাকে হাস্যকর ও বিরক্তিকর করে তুলেছি।

যাই হোক, মনের দাসত্ব যদি ঘোচাতে চাই তা হলে আমাদের শিক্ষার এই দাসভাবটাকে ঘোচাতে হবে। আমাদের আশ্রমে শিক্ষার যদি সেই মুক্তি দিতে না পারি তা হলে এখানকার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যাবে।

কিছুকাল পূর্বে শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের মনে একটি সংকল্পের উদয় হয়েছিল। আমাদের

টোলের চতুষ্পাঠীতে কেবলমাত্র সংস্কৃত শিক্ষাই দেওয়া হয় এবং অন্য সকল শিক্ষাকে একেবারে অবজ্ঞা করা হয়। তার ফলে সেখানকার ছাত্রদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। আমাদের দেশের শিক্ষাকে মূল-আশ্রয়-স্বরূপ অবলম্বন করে তার উপর অন্য সকল শিক্ষার পত্তন করলে তবেই শিক্ষা সত্য ও সম্পূর্ণ হয়। জ্ঞানের আধারটিকে নিজের করে তার উপকরণ পৃথিবীর সর্বত্র হতে সংগ্রহ ও সঞ্চয় করতে হবে। শাস্ত্রীমহাশয় তাঁর এই সংকল্পটিকে কাজে পরিণত করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। কিন্তু নানা বাধায় তখন তিনি তা পারেন নি। এই অধ্যবসায়ের টানে কিছুদিন তিনি আশ্রম ত্যাগ করে গিয়েছিলেন।

তার পর তাঁকে পুনরায় আশ্রমে আহ্বান করে আনা গেল। এবার তাঁকে ক্লাস পড়ানো থেকে নিষ্কৃতি দিলুম। তিনি ভাষাতত্ত্বের চর্চায় প্রবৃত্ত রইলেন। আমার মনে হল —এইরকম কাজই হচ্ছে শিক্ষার যজ্ঞক্ষেত্রে যথার্থ যোগ্য। যাঁরা যথার্থ শিক্ষার্থী তাঁরা যদি এইরকম বিদ্যার সাধকদের চারি দিকে সমবেত হন তা হলে তো ভালোই; আর যদি আমাদের দেশের কপাল-দোষে সমবেত না হন, তা হলেও এই যজ্ঞ ব্যর্থ হবে না। কথার মানে এবং বিদেশের বাঁধা বুলি মুখস্থ করিয়ে ছেলেদের তোতাপাখি করে তোলার চেয়ে এ অনেক ভালো।

এমনি করে কাজ আরম্ভ হল। এই আমাদের বিশ্ব-ভারতীর প্রথম বীজবপন।

বিশ্বভারতী

বিশ-পঞ্চাশ লক্ষ টাকা কুড়িয়ে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পত্তন করবার সাধ্য আমাদের নেই। কিন্তু সেজন্যে হতাশ হতেও চাই নে। বীজের যদি প্রাণ থাকে তা হলে ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হয়ে আপনি বেড়ে উঠবে। সাধনার মধ্যে যদি সত্য থাকে তা হলে উপকরণের অভাবে ক্ষতি হবে না।

আমাদের আসনগুলি ভরে উঠেছে। সংস্কৃত পালি প্রাকৃতভাষা ও শাস্ত্র -অধ্যাপনার জন্য বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় একটিতে বসেছেন, আর-একটিতে আছেন সিংহলের মহাস্থবির; ক্ষিতিমোহনবাবু সমাগত; আর আছেন ভীমশাস্ত্রী মহাশয়। ও দিকে এণ্ড্রুজের চারি দিকে ইংরেজি-সাহিত্যপিপাসুরা সমবেত। ভীমশাস্ত্রী এবং দিনেন্দ্রনাথ সংগীতের অধ্যাপনার ভার নিয়েছেন, আর বিষ্ণুপুরের নকুলেশ্বর গোস্বামী তাঁর সুরবাহার নিয়ে এঁদের সঙ্গে যোগ দিতে আসছেন। শ্রীমান নন্দলাল বসু ও সুরেন্দ্রনাথ কর চিত্রবিদ্যা শিক্ষা দিতে প্রস্তুত হয়েছেন। দূর দেশ হতেও তাঁদের ছাত্র এসে জুটছে। তা ছাড়া আমাদের যার যতটুকু সাধ্য আছে কিছু কিছু কাজ করতে প্রবৃত্ত হব। আমাদের একজন বিহারী বন্ধু সত্বর আসছেন। তিনি পারসি ও উর্দু শিক্ষা দেবেন, ও ক্ষিতিমোহনবাবুর সহায়তায় প্রাচীন হিন্দিসাহিত্যের চর্চা করবেন। মাঝে মাঝে অন্যত্র হতে অধ্যাপক এসে আমাদের উপদেশ দিয়ে যাবেন এমনও আশা আছে।

বিশ্বভারতী

শিশু দুর্বল হয়েই পৃথিবীতে দেখা দেয়। সত্য যখন সেইরকম শিশুর বেশে আসে তখনই তার উপরে আস্থা স্থাপন করা যায়। একেবারে দাড়িগোঁফ-সুদ্ধ যদি কেউ জন্মগ্রহণ করে তা হলে জানা যায় সে একটা বিকৃতি। বিশ্বভারতী একটা মস্ত ভাব, কিন্তু সে অতি ছোটো দেহ নিয়ে আমাদের আশ্রমে উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু ছোটোর ছদ্মবেশে বড়োর আগমন পৃথিবীতে প্রতিদিনই ঘটে, অতএব আনন্দ করা যাক, মঙ্গলশঙ্খ বেজে উঠুক। একান্তমনে এই আশা করা যাক যে, এই শিশু বিধাতার অমৃতভাণ্ডার থেকে অমৃত বহন করে এনেছে; সেই অমৃতই একে ভিতর থেকে বাঁচাবে, বাড়াবে, এবং আমাদেরও বাঁচাবে ও বাড়িয়ে তুলবে।

১৮ আষাঢ় ১৩২৬

শান্তিনিকেতন

৩

আজ বিশ্বভারতী-পরিষদের প্রথম অধিবেশন। কিছু-দিন থেকে বিশ্বভারতীর এই বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ হয়েছে। আজ সর্বসাধারণের হাতে তাকে সমর্পণ করে দেব। বিশ্বভারতীর যাঁরা হিতৈষীবৃন্দ ভারতের সর্বত্র ও ভারতের বাইরে আছেন, এর ভাবের সঙ্গে যাঁদের মনের মিল আছে, যাঁরা একে গ্রহণ করতে দ্বিধা করবেন না, তাঁদেরই হাতে আজ একে সমর্পণ করে দেব।

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, হঠাৎ আজ আমাদের মধ্যে কয়েকজন হিতৈষী বন্ধু সমাগত হয়েছেন, যাঁরা দেশে ও দেশের বাইরে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। সকলে জানেন —আজ এখানে ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, ডাক্তার নীলরতন সরকার এবং ডাক্তার শিশিরকুমার মৈত্র উপস্থিত আছেন। আমাদের আরও সৌভাগ্য যে, সমুদ্রপার থেকে এখানে একজন মনীষী এসেছেন, যাঁর খ্যাতি সর্বত্র বিস্তৃত। আজ আমাদের কর্মে যোগদান করতে পরমসুহৃদ্‌ আচার্য সিলভ্যাঁ লেভি মহাশয় এসেছেন। আমাদের সৌভাগ্য যে, আমাদের এই প্রথম অধিবেশনে, যখন আমরা বিশ্বের সঙ্গে বিশ্ব-ভারতীর যোগসাধন করতে প্রবৃত্ত হয়েছি সেই সভাতে, আমরা এঁকে পাশ্চাত্য দেশের প্রতিনিধি-রূপে পেয়েছি। ভারতবর্ষের চিত্তের সঙ্গে এঁর চিত্তের সম্বন্ধবন্ধন অনেক

দিন থেকে স্থাপিত হয়েছে। ভারতবর্ষের আতিথ্য তিনি আশ্রমে আমাদের মধ্যে লাভ করুন। যে-সকল সুহৃদ্ আজ এখানে উপস্থিত আছেন তাঁরা আমাদের হাত থেকে এর ভার গ্রহণ করুন। এই বিশ্বভারতীকে আমরা কিছুদিন লালনপালন করলুম, একে বিশ্বের হাতে সমর্পণ করবার এই সময় এসেছে। একে এঁরা প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করুন, এর সঙ্গে আপনার চিত্তের সম্বন্ধ স্থাপন করুন। এই কামনা নিয়ে আমি আচার্য শীল মহাশয়কে সকলের সম্মতিক্রমে বরণ করেছি; তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করে কর্ম সম্পন্ন করুন, বিশ্বের প্রতিনিধিরূপে আমাদের হাত থেকে একে গ্রহণ করে বিশ্বের সম্মুখে স্থাপন করুন। তিনি এ বিষয়ে যেমন করে বুঝবেন তেমন আর কেউ পারবেন না। তিনি উদার দৃষ্টিতে জ্ঞানরাজ্যকে দেখেছেন। কেবল অসাধারণ পাণ্ডিত্য থাকলেই তা হতে পারে না, কারণ অনেক সময়ে পাণ্ডিত্যের দ্বারা ভেদ-বুদ্ধি ঘটে। কিন্তু তিনি আত্মিক দৃষ্টিতে জ্ঞানরাজ্যের ভিতরের ঐক্যকে গ্রহণ করেছেন। আজকের দিনে তাঁর চেয়ে বিশ্বভারতীকে গ্রহণ করবার যোগ্য আর কেউ নেই। আনন্দের সহিত তাঁর হাতে একে সমর্পণ করছি। তিনি আমাদের হয়ে সকলের সামনে একে উপস্থিত করুন এবং তাঁর চিত্তে যদি বাধা না থাকে তবে নিজে এতে স্থান গ্রহণ করুন, একে আপনার করে বিশ্বের সঙ্গে যোগযুক্ত করুন।

বিশ্বভারতী

বিশ্বভারতীর মর্মের কথাটি আগে বলি, কারণ অনেকে হয়তো ভালো করে তা জানেন না। কয়েক বৎসর পূর্বে আমাদের পরমসুহৃদ্ বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের মনে সংকল্প হয়েছিল যে, আমাদের দেশে সংস্কৃতশিক্ষা যাকে বলা হয় তার অনুষ্ঠান ও প্রণালীর বিস্তারসাধন করা দরকার। তাঁর খুব ইচ্ছা হয়েছিল যে, আমাদের দেশে টোল ও চতুষ্পাঠী রূপে যে-সকল বিদ্যায়তন আছে তার অধিকারকে প্রসারিত করতে হবে। তাঁর মনে হয়েছিল যে, যে কালকে আশ্রয় করে এদের প্রতিষ্ঠা সে কালে এদের উপযোগিতার কোনো অভাব ছিল না। কিন্তু কালের পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমানে গবর্মেণ্টের দ্বারা যে-সব বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেগুলি এই দেশের নিজের সৃষ্টি নয়। কিন্তু আমাদের দেশের প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের পুরাকালের এই বিদ্যালয়গুলির মিল আছে; এরা আমাদের নিজের সৃষ্টি। এখন কেবল দরকার এদের ভিতর দিয়ে নূতন যুগের স্পন্দন, তার আহ্বান, প্রকাশ পাওয়া; না যদি পায় তো বুঝতে হবে তারা সাড়া দিচ্ছে না, মরে গেছে। এই সংকল্প মনে রেখে তিনি নিজের গ্রামে যান; সে সূত্রে তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ তখনকার মতো বিযুক্ত হওয়াতে দুঃখিত হয়েছিলুম, যদিও আমি জানতুম যে ভিতরকার দিক দিয়ে সে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। তার পর নানা বাধায় তিনি গ্রামে চতুষ্পাঠী স্থাপন করতে পারেন নি। তখন আমি তাঁকে আশ্বাস

দিলাম, তাঁর ইচ্ছাসাধন এখানেই হবে, এই স্থানই তাঁর প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র। এমনিভাবে বিশ্বভারতীর আরম্ভ হল।

গাছের বীজ ক্রমে ক্রমে প্রাণের নিয়মে বিস্তৃতি লাভ করে। সে বিস্তার এমন করে ঘটে যে, সেই বীজের সীমার মধ্যে তাকে আর ধরেই না। তেমনি প্রথমে যে শিক্ষার আয়তনকে মনে করেছিলাম দেশের প্রয়োজনের মধ্যেই অবরুদ্ধ থাকবে, ক্রমে তা বৃহৎ আকাশে মুক্তিলাভের চেষ্টা করতে লাগল। যে অনুষ্ঠান সত্য তার উপরে দাবি সমস্ত বিশ্বের; তাকে বিশেষ প্রয়োজনে খর্ব করতে চাইলে তার সত্যতাকেই খর্ব করা হয়। এবার পশ্চিমে গিয়ে দেখেছি যে, পূর্ব-মহাদেশ কী সম্পদ দিতে পারে তা সকলে জানতে চাচ্ছে। আজ মানুষকে বেদনা পেতে হয়েছে। সে পুরাকালে যে আশ্রয়কে নির্মাণ করেছিল তার ভিত্তি বিদীর্ণ হয়ে গেছে। তাতে করে মানুষের মনে হয়েছে, এ আশ্রয় তার অভাবকে পূর্ণ করবার উপযোগী নয়। পশ্চিমের মনীষীরাও এ কথা বুঝতে পেরেছেন, এবং মানুষের সাধনা কোন্ পথে গেলে সে অভাব পূর্ণ হবে তাঁদের তা উপলব্ধি করবার ইচ্ছা হয়েছে।

কোনো জাতি যদি স্বাজাত্যের ঔদ্ধত্য-বশত আপন ধর্ম ও সম্পদকে একান্ত আপন বলে মনে করে তবে সেই অহংকারের প্রাচীর দিয়ে সে তার সত্য সম্পদকে বেষ্টন করে রাখতে পারবে না। যদি সে তার অহংকারের দ্বারা সত্যকে কেবলমাত্র স্বকীয় করতে যায় তবে তার সে সত্য

বিনষ্ট হয়ে যাবে। আজ পৃথিবীর সর্বত্র এই বিশ্ববোধ উদ্‌বুদ্ধ হতে যাচ্ছে। ভারতবর্ষে কি এই যুগের সাধনা স্থান পাবে না? আমরা কি এ কথাই বলব যে, মানবের বড়ো অভিপ্রায়কে দূরে রেখে ক্ষুদ্র অভিপ্রায় নিয়ে আমরা থাকতে চাই? তবে কি আমরা মানুষের যে গৌরব তার থেকে বঞ্চিত হব না? স্বজাতির অচল সীমানার মধ্যে আপনাকে সংকীর্ণভাবে উপলব্ধি করাই কি সবচেয়ে বড়ো গৌরব?

এই বিশ্বভারতী ভারতবর্ষের জিনিস হলেও একে সমস্ত মানবের তপস্যার ক্ষেত্র করতে হবে। কিন্তু আমাদের দেবার কী আছে। কল্যাণরূপী শিব তাঁর ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে বেরিয়েছেন। সে ঝুলিতে কে কী দান করবে? শিব সমস্ত মানুষের কাছে সেই ঝুলি নিয়ে এসেছেন। আমাদের কি তাঁকে কিছু দেবার নেই? হাঁ, আমাদের দেবার আছে —এই কথা ভেবেই কাজ করতে হবে। এইজন্যই ভারতের ক্ষেত্রে বিশ্বভারতীকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই।

৮ পৌষ ১৩২৮

শান্তিনিকেতন

বিশ্বভারতী পরিষদ্‌-সভার প্রতিষ্ঠা-উৎসব

সিলভ্যাঁ লেভির ক্লাস

৪

কোনো জিনিসের আরম্ভ কী করে হয় তা বলা যায় না। সেই আরম্ভকালটি রহস্যে আবৃত থাকে। আমি চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত পদ্মার বোটে কাটিয়েছি, আমার প্রতিবেশী ছিল বালিচরের চক্রবাকের দল। তাদের মধ্যে বসে বসে আমি বই লিখেছি। হয়তো চিরকাল এই-ভাবেই কাটাতুম। কিন্তু মন হঠাৎ কেন বিদ্রোহী হল, কেন ভাবজগৎ থেকে কর্মজগতে প্রবেশ করলাম ?

আমি বাল্যকালের শিক্ষাব্যবস্থায় মনে বড়ো পীড়া অনুভব করেছি। সেই ব্যবস্থায় আমাকে এত ক্লেশ দিত আঘাত করত যে বড়ো হয়েও সে অন্যায় ভুলতে পারি নি। কারণ প্রকৃতির বক্ষ থেকে, মানবজীবনের সংস্পর্শ থেকে স্বতন্ত্র করে নিয়ে শিশুকে বিদ্যালয়ের কলের মধ্যে ফেলা হয়। তার অস্বাভাবিক পরিবেষ্টনের নিষ্পেষণে শিশুচিত্ত প্রতিদিন পীড়িত হতে থাকে। আমরা নর্মাল ইস্কুলে পড়তাম। সেটা ছিল মল্লিকদের বাড়ি। সেখানে গাছপালা নেই, মার্বেলের উঠান আর ইঁটের উঁচু দেওয়াল যেন আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে থাকত। আমরা, যাদের শিশুপ্রকৃতির মধ্যে প্রাণের উদ্যম সতেজ ছিল, এতে বড়োই দুঃখ পেতাম। প্রকৃতির সাহচর্য থেকে দূরে থেকে আর মাস্টারদের সঙ্গে প্রাণগত যোগ থেকে

বঞ্চিত হয়ে আমাদের আত্মা যেন শুকিয়ে যেত। মাস্টাররা সব আমাদের মনে বিভীষিকার সৃষ্টি করত।

প্রাণের সম্বন্ধ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এই-যে বিদ্যা লাভ করা যায় এটা কখনও জীবনের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে পারে না।

আমি এ বিষয়ে কখনও কখনও বক্তৃতাও দিয়েছিলেম। কিন্তু যখন দেখলাম যে আমার কথাগুলি শ্রুতিমধুর কবিত্ব হিসাবে সকলে নিলেন এবং যাঁরা কথাটাকে মানলেন তাঁরা এটাকে কাজে খাটাবার কোনো উদ্যোগ করলেন না, তখন আমার ভাবকে কর্মের মধ্যে আকার দান করবার জন্য আমি নিজেই কৃতসংকল্প হলাম। আমার আকাঙ্ক্ষা হল, আমি ছেলেদের খুশি করব, প্রকৃতির গাছপালাই তাদের অন্যতম শিক্ষক হবে, জীবনের সহচর হবে— এমনি করে বিদ্যার একটি প্রাণনিকেতন নীড় তৈরি করে তুলব।

তখন আমার ঘাড়ে মস্ত একটা দেনা ছিল; সে দেনা আমার সম্পূর্ণ স্বকৃত নয়, কিন্তু তার দায় আমারই একলার। দেনার পরিমাণ লক্ষ টাকারও অধিক ছিল। আমার এক পয়সার সম্পত্তি ছিল না, মাসিক বরাদ্দ অতি সামান্য। আমার বইয়ের কপিরাইট প্রভৃতি আমার সাধ্যায়ত্ত সামগ্রী কিছু কিছু সওদা করে অসাধ্যসাধনে লেগে গেলাম। আমার ডাক দেশের কোথাও পৌঁছয় নি। কেবল ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়কে পাওয়া গিয়েছিল, তিনি

তখনও রাজনীতিক্ষেত্রে নামেন নি। তাঁর কাছে আমার এই সংকল্প খুব ভালো লাগল, তিনি এখানে এলেন। কিন্তু তিনি জমবার আগেই কাজ আরম্ভ করে দিয়েছিলাম। আমি পাঁচ-ছয়টি ছেলে নিয়ে জামগাছ-তলায় তাদের পড়াতাম। আমার নিজের বেশি বিদ্যে ছিল না। কিন্তু আমি যা পারি তা করেছি। সেই ছেলে-কয়টিকে নিয়ে রস দিয়ে ভাব দিয়ে রামায়ণ মহাভারত পড়িয়েছি— তাদের কাঁদিয়েছি হাসিয়েছি, ঘনিষ্ঠভাবে তাদের সঙ্গে যুক্ত থেকে তাদের মানুষ করেছি।

এক সময়ে নিজের অনভিজ্ঞতার খেদে আমার হঠাৎ মনে হল যে, একজন হেডমাস্টারের নেহাত দরকার। কে যেন একজন লোকের নাম করে বললে, 'অমুক লোকটি একজন ওস্তাদ শিক্ষক, যাকে তাঁর পাশের সোনার কাঠি ছুঁইয়েছেন সেই পাশ হয়ে গেছে।' — তিনি তো এলেন, কিন্তু কয়েক দিন সব দেখেশুনে বললেন, 'ছেলেরা গাছে চড়ে, চেঁচিয়ে কথা কয়, দৌড়য়, এ তো ভালো না।' আমি বললাম, 'দেখুন, আপনার বয়সে তো কখনও তারা গাছে চড়বে না। এখন একটু চড়তেই দিন-না। গাছ যখন ডালপালা মেলেছে তখন সে মানুষকে ডাক দিচ্ছে। ওরা ওতে চ'ড়ে পা ঝুলিয়ে থাকলই-বা।' তিনি আমার মতিগতি দেখে বিরক্ত হলেন। মনে আছে, তিনি কিণ্ডারগার্টেন-প্রণালীতে পড়াবার চেষ্টা করতেন। তাল গোল, বেল গোল, মানুষের মাথা গোল— ইত্যাদি সব

পাঠ শেখাতেন। তিনি ছিলেন পাশের ধুরন্ধর পণ্ডিত, ম্যাট্রিকের কর্ণধার। কিন্তু এখানে তাঁর বনল না, তিনি বিদায় নিলেন। তার পর থেকে আর হেডমাস্টার রাখি নি।

এ সামান্য ব্যাপার নয়, পৃথিবীতে অল্প বিদ্যালয়েই ছেলেরা এত বেশি ছাড়া পেয়েছে। আমি এ নিয়ে মাস্টারদের সঙ্গে লড়াই করেছি। আমি ছেলেদের বললাম, 'তোমরা আশ্রম-সম্মিলনী করো, তোমাদের ভার তোমরা নাও।' আমি কিছুতে আমার সংকল্প ত্যাগ করি নি— আমি ছেলেদের উপর জবরদস্তি হতে দিই নি। তারা গান গায়, গাছে চড়ে, ছবি আঁকে, পরস্পরের সঙ্গে অন্তরঙ্গ ও বাধামুক্ত সম্বন্ধে যুক্ত হয়ে আছে।

এখানকার শিশুশিক্ষার আর-একটা দিক আছে। সেটা হচ্ছে— জীবনের গভীর ও মহৎ তাৎপর্য ছোটো ছেলেদের বুঝতে দেওয়া। আমাদের দেশের সাধনার মন্ত্র হচ্ছে, যা মহৎ তাতেই সুখ, অল্পে সুখ নেই। কিন্তু একা রাজনীতিই এখন সেই বড়ো মহতের স্থান সমস্তটাই জুড়ে বসে আছে। আমার কথা এই যে, সবচেয়ে বড়ো যে আদর্শ মানুষের আছে তা ছেলেদের জানতে দিতে হবে। তাই আমরা এখানে সকালে সন্ধ্যায় আমাদের প্রাচীন তপোবনের মহৎ কোনো বাণী উচ্চারণ করি, স্থির হয়ে কিছুক্ষণ বসি। এতে আর-কিছু না হোক, একটা স্বীকারোক্তি আছে। এই অনুষ্ঠানের দ্বারা ছোটো

ছেলেরা একটা বড়ো জিনিসের ইশারা পায়। হয়তো তারা উপাসনায় বসে হাত-পা নাড়ছে, চঞ্চল হয়ে উঠছে, কিন্তু এই আসনে বসবার একটা গভীর তাৎপর্য দিনে দিনে তাদের মনের মধ্যে গিয়ে পৌঁছয়।

এখানে ছেলেরা জীবনের আরম্ভকালকে বিচিত্র রসে পূর্ণ করে নেবে, এই আমার অভিপ্রায় ছিল। প্রকৃতির সঙ্গে নিত্যযোগে গানে অভিনয়ে ছবিতে আনন্দরস আস্বাদনের নিত্যচর্চায় শিশুদের মগ্ন চৈতন্যে আনন্দের স্মৃতি সঞ্চিত হয়ে উঠবে, এইটেকেই লক্ষ্য করে কাজ আরম্ভ করা গেল।

কিন্তু শুধু এটাকেই চরম লক্ষ্য বলে এই বিদ্যালয় স্বীকার করে নেয় নি। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করবার আমার প্রথম উদ্দেশ্য ছিল, বাঙালির ছেলেরা এখানে মানুষ হবে, রূপে রসে গন্ধে বর্ণে চিত্রে সংগীতে তাদের হৃদয় শতদলপদ্মের মতো আনন্দে বিকশিত হয়ে উঠবে। কিন্তু আমার মনের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে এর উদ্দেশ্যও গভীরতর হল। এখানকার এই বাঙালির ছেলেরা তাদের কলহাস্যের দ্বারা আমার মনে একটি ব্যাকুল চঞ্চলতার সৃষ্টি করল। আমি স্তব্ধ হয়ে বসে এদের আনন্দপূর্ণ কণ্ঠস্বর শুনেছি। দূর থেকে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার মনে হয়েছে যে, এই আনন্দ, এ যে নিখিল মানবচিত্ত থেকে বিনিঃসৃত অমৃত-উৎসের একটি ধারা। আমি এই শিশুদের মধ্যে সেই স্পর্শ পেয়েছি।

বিশ্বচিত্তের বসুন্ধরার সমস্ত মানবসন্তান যেখানে আনন্দিত হচ্ছে সেই বিরাট ক্ষেত্রে আমি হৃদয়কে বিস্তৃত করে দিয়েছি। যেখানে মানুষের বৃহৎ প্রাণময় তীর্থ আছে, যেখানে প্রতিদিন মানুষের ইতিহাস গড়ে উঠছে, সেখানে আমার মন যাত্রা করেছে। পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত ইংরেজি লিখি নি, ইংরেজি যে ভালো করে জানি তা ধারণা ছিল না। মাতৃভাষাই তখন আমার সম্বল ছিল। যখন ইংরেজি চিঠি লিখতাম তখন অজিত বা আর-কাউকে দিয়ে লিখিয়েছি। আমি তেরো বছর পর্যন্ত ইস্কুলে পড়েছি, তার পর থেকে পলাতক ছাত্র। পঞ্চাশ বছর বয়সের সময় যখন আমি আমার লেখার অনুবাদ করতে প্রবৃত্ত হলাম তখন গীতাঞ্জলির গানে আমার মনে ভাবের একটা উদ্‌বোধন হয়েছিল বলে সেই গানগুলিই অনুবাদ করলাম। সেই তর্জমার বই আমার পশ্চিম-মহাদেশ-যাত্রার যথার্থ পাথেয়স্বরূপ হল। দৈবক্রমে আমার দেশের বাইরেকার পৃথিবীতে আমার স্থান হল, ইচ্ছা করে নয়। এই সম্মানের সঙ্গে সঙ্গে আমার দায়িত্ব বেড়ে গেল।

যতক্ষণ বীজ বীজই থাকে ততক্ষণ সে নিজের মধ্যেই থাকে। তার পরে যখন অঙ্কুরিত হয়ে বৃক্ষরূপে আকাশে বিস্তৃতি লাভ করে তখন সে বিশ্বের জিনিস হয়। এই বিদ্যালয় বাংলার এক প্রান্তে কয়েকটি বাঙালির ছেলে নিয়ে তার ক্ষুদ্র সামর্থ্যের মধ্যে কোণ আঁকড়ে পড়ে ছিল। কিন্তু সব সজীব পদার্থের মতো তার অন্তরে পরিণতির

একটা সময় এল। তখন সে আর একান্ত সীমাবদ্ধ মাটির জিনিস রইল না, তখন সে উপরের আকাশে মাথা তুলল, বড়ো পৃথিবীর সঙ্গে তার অন্তরের যোগসাধন হল; বিশ্ব তাকে আপন বলে দাবি করল।

আধুনিক কালের পৃথিবীর ভৌগোলিক সীমা ভেঙে গেছে, মানুষ পরস্পরের নিকটতর হয়েছে, এই সত্যকে আমাদের গ্রহণ করতে হবে। মানুষের এই মিলনের ভিত্তি হবে প্রেম, বিদ্বেষ নয়। মানুষ বিষয়ব্যবহারে আজ পরস্পরকে পীড়ন করছে, বঞ্চিত করছে, এ কথা আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু সত্যসাধনায় পূর্ব-পশ্চিম নেই। বুদ্ধদেবের শিক্ষা ভারতবর্ষের মাটিতে উদ্ভূত হয়ে চীনদেশে গিয়ে মানবচিত্তকে আঘাত করল এবং ক্রমে সমস্ত এশিয়াকে অধিকার করল। চিরন্তন সত্যের মধ্যে পূর্ব-পশ্চিমের ভেদ নেই। এই বিশ্বভারতীতে সেই সত্যসাধনার ক্ষেত্রকে আমার গড়ে তুলতে হবে। পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের দেওয়া-নেওয়ার সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া দরকার। আমরা এতদিন পর্যন্ত ইংরেজি বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘স্কুলবয়’ ছিলাম, কেবলই পশ্চিমের কাছে হাত পেতে পাঠ শিখে নিয়েছি। কিন্তু পশ্চিমের সঙ্গে আমাদের আদানপ্রদানের সম্বন্ধ হয় নি। সাহসপূর্বক য়ুরোপকে আমি আমাদের শিক্ষা-কেন্দ্রে আমন্ত্রণ করে এসেছি। এখানে এইরূপে সত্যসম্মিলন হবে, জ্ঞানের তীর্থক্ষেত্র গড়ে উঠবে। আমরা রাষ্ট্রনীতি-ক্ষেত্রে খুব মৌখিক বড়াই করে থাকি, কিন্তু অন্তরে

আমাদের আত্মবিশ্বাস নেই, যথেষ্ট দীনতা আছে। যেখানে মনের ঐশ্বর্যের প্রকৃত প্রাচুর্য আছে সেখানে কার্পণ্য সম্ভবপর হয় না। আপন সম্পদের প্রতি যে জাতির যথার্থ আশা ও বিশ্বাস আছে অন্যকে বিতরণ করতে তার সংকোচ হয় না, সে পরকে ডেকে বিলোতে চায়। আমাদের দেশে তাই গুরুর কণ্ঠে এই আহ্বানবাণী এক সময় ঘোষিত হয়েছিল— আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা।

আমরা সকলের থেকে দূরে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিদ্যার নির্জন কারাবাসে রুদ্ধ হয়ে থাকতে চাই। কারারক্ষী যা দয়া করে খেতে দেবে তাই নিয়ে টিঁকে থাকবার মতলব করেছি। এই বিচ্ছিন্নতার থেকে ভারতবর্ষকে মুক্তিদান করা সহজ ব্যাপার নয়। সেবা করবার ও সেবা আদায় করবার, দান করবার ও দান গ্রহণ করবার সম্বন্ধকে আমাদের তৈরি করে তুলতে হবে। বিশ্বের জ্ঞানজগৎ থেকে ভারতবর্ষ একঘরে হয়ে আছে, তাকে শিক্ষার ছিটে-ফোঁটা দিয়ে চিরকেলে পাঠশালার পোড়ো করে রাখা হয়েছে। আমরা পৃথিবীর জ্ঞানধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিগত অবমাননা থেকে মুক্তি পেতে চাই।

ভারতবর্ষ তার আপন মনকে জানুক এবং আধুনিক সকল লাঞ্ছনা থেকে উদ্ধার লাভ করুক। রামানুজ শংকরাচার্য বুদ্ধদেব প্রভৃতি বড়ো বড়ো মনীষীরা ভারতবর্ষে বিশ্বসমস্যার যে সমাধান করবার চেষ্টা করেছিলেন তা

আমাদের জানতে হবে। জোরাস্ট্রীয় ইসলাম প্রভৃতি এশিয়ার বড়ো বড়ো শিক্ষাসাধনার সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। ভারতবর্ষের কেবল হিন্দুচিত্তকে স্বীকার করলে চলবে না। ভারতবর্ষের সাহিত্য শিল্পকলা স্থপতিবিজ্ঞান প্রভৃতিতেও হিন্দুমুসলমানের সংমিশ্রণে বিচিত্র সৃষ্টি জেগে উঠেছে। তারই পরিচয়ে ভারতবর্ষীয়ের পূর্ণ পরিচয়। সেই পরিচয় পাবার উপযুক্ত কোনো শিক্ষাস্থানের প্রতিষ্ঠা হয় নি বলেই তো আমাদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ ও দুর্বল।

ভারতের বিরাট সত্তা বিচিত্রকে আপনার মধ্যে একত্র সম্মিলিত করবার চেষ্টা করছে। তার সেই তপস্যাকে উপলব্ধি করবার একটা সাধনক্ষেত্র আমাদের চাই তো। বিশ্বভারতীতে সেই কাজটি হতে পারে। বিশ্বের হাটে যদি আমাদের বিদ্যার যাচাই না হয় তবে আমাদের জ্ঞান সম্পূর্ণ হল না। ঘরের কোণে বসে আত্মীয়স্বজনে বৈঠকে যে অহংকার নিবিড় হতে থাকে সেটা সত্য পদার্থ নয়। মানুষের জ্ঞানচর্চার বৃহৎ ক্ষেত্রের সঙ্গে যোগ হলেই তবে আমাদের বিদ্যার সার্থকতা হবে। বিশ্বভারতীর এই লক্ষ্য সার্থক হোক।

২০ ফাল্গুন ১৩২৮

শান্তিনিকেতন

৫

আপনারা যাঁরা আজ এখানে সমবেত হয়েছেন, আপনাদের সকলের সঙ্গে ক্রমশ আমাদের যোগ ঘনিষ্ঠ হবে, সাক্ষাৎসম্বন্ধ স্থাপিত হবে। বিশ্বভারতীর ভিতরকার আদর্শ ক্রমে দিনে দিনে আপনাদের কাছে পরিস্ফুট হবে। বিশ্বভারতীর সব প্রতিষ্ঠানগুলি যেমন যেমন জেগে উঠতে থাকবে তেমন তেমন তার মধ্য দিয়ে এর ভিতরকার রূপটি আপনাদের কাছে জাগতে থাকবে। বাইরে থেকে এ সম্বন্ধে কথা বলতে কুণ্ঠা বোধ হয়, কারণ ভিতরের বড়ো আইডিয়ালকে বাইরে আকার দান করতে গেলে দুইয়ের মধ্যে অসামঞ্জস্য থেকে যাবেই। বাইরের অসম্পূর্ণতার সঙ্গে কোনো আই-ডিয়ালের ভিতরের মহত্ত্বের মধ্যেকার ব্যবধান যখন চোখে পড়ে তখন গোড়াকার বাক্যাড়ম্বরের পরে তা অনেকের কাছে হতাশার ও লজ্জার কারণ হয়। আইডিয়ালকে প্রকাশ করে তোলা কারও একলার সাধ্য নয়, কারণ তা দু-একজনের বিশেষ সময়কার কর্ম নয়। প্রথমে যে অনুধাবনায় আরম্ভ হয় সেই প্রথম ধাক্কাই তার যথার্থ পরিচয় নয়। হৃদয় কর্ম ও জীবন দিয়ে নানা কর্মীর সহায়তায় তা ফুটে উঠতে থাকে। তার প্রথমকার চেহারা ভিতরকার সেই সত্যটিকে যথার্থ ব্যক্ত করতে পারে না। এইজন্যই এই প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে কিছু বলতে আমি কুণ্ঠিত হই।

বিশ্বভারতী

বিশ্বভারতী যে ভাব ও আদর্শকে পোষণ করছে, যে পূর্ণসত্যটিকে অন্তরে ধারণ করে রয়েছে, তা বাইরে থেকে সমাগত অতিথিরা এবং এর কর্মভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা অনেকে নানা অসম্পূর্ণতার মধ্য দিয়েও গ্রহণ করেছেন ও শ্রদ্ধা করেছেন। এতে আমাদের উৎসাহের সঞ্চার হয়েছে। স্বদেশের সকলের সঙ্গে এর যথার্থ আন্তরিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নি। এমনকি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত হয়ে রয়েছেন তাঁরাও অনেকে ভিতরের সত্যমূর্তিটিকে না দেখে এর পদ্ধতি অনুষ্ঠান উপকরণ-সংগ্রহ প্রভৃতি বাহ্যরূপটিকে দেখছেন, সেখানে আপনার অধিকার নিয়ে আক্ষেপ করছেন। এর কারণ হচ্ছে যে, আমি যে ভাবটিকে প্রকাশ করতে চাই বর্তমান কালে সকলের চিত্ত সে দিকে নেই। তাঁরা কতকগুলি আকস্মিক ও আধুনিক চেষ্টায় নিযুক্ত আছেন, বড়ো প্রয়োজনের সমাদর করতে তাঁদের মন চাচ্ছে না। কিম্বা হয়তো আমার নিজের অক্ষমতা ও দুর্ভাগ্য এর কারণ হতে পারে। হয়তো আমার নিজের জীবনের যা লক্ষ্য অন্যদের কাছ থেকে তার স্বীকৃতি পাবার আমার শক্তি নেই। যার ডাক পড়ে, যার আপনার থেকে আদেশ আসে তারই তাতে গরজ আর দায়িত্ব আছে। যদি সে তার জীবনের উদ্দেশ্য সকলের কাছে এমন করে না ধরতে পারে যাতে করে তা অপরের গ্রহণযোগ্য হয় তবে তারই নিজের অক্ষমতা প্রকাশ পায়। হয়তো আমারই চরিত্রের এমন অসম্পূর্ণতা আছে যাতে

আমার আপনার কর্ম দেশের কর্ম হয়ে উঠতে পারছে না। কিন্তু আমার আশা আছে যে, সমস্তই নিষ্ফল হয় নি। কারণ প্রতিষ্ঠানটিকে তো শুধু আমার একলার জিনিস বলতে পারি না। সেখানে যারা মিলিত হয়েছে তাদের দ্বারা সৃজনকার্য নিরন্তর চলেছে। সেখানে দিনে দিনে যে আবহাওয়া তৈরি হয়ে উঠছে, প্রতি শিশুটি পর্যন্ত তাদের অবকাশমুখরিত সংগীত অভিনয় কলহাস্যের দ্বারাও তার সহায়তা করছে। প্রত্যেকটি শিশু প্রত্যেকটি ছাত্র ও অধ্যাপক না বুঝেও অগোচরে সত্যসাধনায় সহযোগিতা করছেন। তাঁদের দ্বারা যেটুকু কর্ম পরিব্যক্ত হচ্ছে তার উপর আমার বিশ্বাস আছে; আশা আছে যে, একদিন এর বীজ নিঃসন্দেহ পরিপূর্ণ বৃক্ষ-রূপে উপরের আকাশে মাথা তুলবে।

আমার মনে হয়েছে যে, আমাদের এই প্রদেশবাসীদের মধ্যে যেসব ছাত্রের উৎসাহ ও কৌতূহল আছে তারা কেন এই বৃক্ষের ফল ভোগ করবে না। বিশ্বভারতীতে আমরা যে চিন্তা করছি, যে সত্য সন্ধান করছি সেখানে স্বদেশী ও বিদেশী পণ্ডিতেরা যে তত্ত্বালোচনায় ব্যাপৃত আছেন, তাঁরা যা-কিছু দিচ্ছেন, ছোটো জায়গায় সেই উৎপন্ন পদার্থের নিঃশেষ হয়ে গেলে তার অপব্যয় হবে। তা অল্প পরিধিতে বদ্ধ থাকলে তাতে সকলের গ্রহণ করবার সুযোগ হয় না। যদিচ শান্তিনিকেতনই আমার কেন্দ্রস্থল তবুও সেখানে যারা সমাগত হবে যাদের

হাতে কলমে কাজ করাতে হবে তারাই যে শুধু আইডিয়াল গ্রহণ করবার যথার্থ যোগ্য তা তো নয়। তাই আমার মনে হয়েছে এবং অনেক ছাত্র ও ছাত্রবন্ধুরা আমাকে বলেছেন যে, বিশ্বভারতীতে যে সৃষ্টি হচ্ছে, যে সত্য আবিষ্কৃত হচ্ছে, তা যাতে কলকাতার ছাত্রমণ্ডলীও জানতে পারে, যাতে তারাও উপলব্ধি করতে পারে যে, সেখানে জীবনের সাধনা হচ্ছে, শুধু পুঁথিগত বিদ্যার চর্চা হচ্ছে না, সেজন্য সংগীত শিল্প সাহিত্যের নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তার পরিচয়ের ব্যবস্থা করা উচিত। আমি এই প্রস্তাবে সম্মত হয়েছিলুম, কিন্তু অতি সসংকোচে; কারণ দেশের ছাত্রদের সঙ্গে আমার তেমন পরিচয় নেই। ভয় হয়েছিল যে, যে লোকেরা এত কাল এত ভুল বুঝে এসেছে হয়তো তারা বিদ্রূপ করবে। বড়ো আইডিয়ালকে নিয়ে বিদ্রূপ করার মতো এত সহজ জিনিস আর নেই। যে খুব ছোটো সেও কোনো বড়ো জিনিসে ধুলো দিতে পারে, তাকে বিকৃত করতে পারে।

এই আইডিয়ালের সঙ্গে এখনকার কালের যোগ নেই, এই কথা অনুভব করেছিলাম বলেই আমি বিশ বছর পর্যন্ত নিভৃত কোণে ছিলুম। এত গোপনে আমার কাজ করে গেছি যে, আমার পরমাত্মীয়েরাও জানেন নি, বোঝেন নি। আমি কী লক্ষ্য নিয়ে কেন অন্যসব কাজ ছেড়ে দিয়ে অবকাশ ত্যাগ করে কোন্ ডাকে কোন্ আনন্দে এই কাজে লিপ্ত হয়েছি আমার সহকর্মীরাও অনেকে তা

পুরোপুরি জানে না। তৎসত্ত্বে আমি আমার বিদ্যালয়ের ছেলেদের মধ্যে যে আনন্দের ছবি, যে স্বাধীন বিকাশের প্রমাণ পেয়েছি তাতে নিশ্চিত জেনেছি যে, এরা এখান থেকে কিছু পেয়েছে। এইসকল কারণেই আমি এতদিন বাহিরে বেরিয়ে আসি নি।

বিশ্বভারতীকে দুইভাবে দেখা যেতে পারে— প্রথম হচ্ছে শান্তিনিকেতনে তার যে কাজ হচ্ছে সেই কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করা ; দ্বিতীয়ত শান্তিনিকেতনের কর্মানুষ্ঠানের ফল বাইরে থেকে ভোগ করা, তার সঙ্গে বাইরে থেকে যুক্ত হওয়া। বিশ্বভারতীর আইডিয়ালের সঙ্গে যাঁর সহানুভূতি আছে তিনি সেই প্রতিষ্ঠানের সভ্য হয়ে তার আদর্শ-পোষণের ভার নিতে পারেন। তিনি তার জন্য চিন্তা করবেন, চেষ্টা করে গড়ে তুলবেন, তাকে আঘাত থেকে রক্ষা করবেন। এটা হল এর দায়িত্বের দিক এবং আত্মীয়-সমাজের লোকেদের কাজ। এর জন্য বিশ্বভারতীর দ্বার উদ্‌ঘাটিত রয়েছে। কিন্তু লোকে তো এ কথা বলতে পারে যে, আমাদের এসব ভালো লাগে না, বিদেশ থেকে কেন এসব অধ্যাপকদের আনানো ; ভারতবর্ষ তো আপনার পরিধির মধ্যেই বেশ ছিল। যাঁরা এ কথা বলেন তাঁদের সঙ্গেও আমাদের কোনো বাদপ্রতিবাদ নেই। তাঁরা এই প্রতিকূলতা সত্ত্বেও কলকাতার এই 'বিশ্বভারতী সম্মিলনী'র সভ্য হতে পারেন, তাতে কারও আপত্তি নেই। যদি আমরা কিছু গান সংগ্রহ করে আনি তবে তাঁরা যে তা

শুনবেন না এমন কোনো কথা নেই, কিম্বা আমাদের যদি কিছু বলবার থাকে তবে তাও তাঁরা শুনতে আসতে পারেন— এই যেমন ক্ষিতিমোহনবাবু সেদিন কবীর সম্বন্ধে বললেন, বা আজ যে আচার্য লেভির বিদায়ের পূর্বে তাঁকে সম্বর্ধনা করা হল। এই পণ্ডিত বিদেশী হলেও তো এঁকে বিশেষ কোনো দেশের লোক বলা চলে না— ইনি আমাদের আপনার লোক হয়ে গেছেন, আমাদের দেশকে গভীরভাবে হৃদয়ে গ্রহণ করেছেন। এঁর সঙ্গে যে পরিচয়সাধন হল এতে করে তো কেউ কোনো আঘাত পান নি।

বর্তমান যুগে ইতিহাস হঠাৎ যেন নতুন দিকে বাঁক নেবার চেষ্টা করছে। কেন? আপনার জাতির একান্ত উৎকর্ষের জন্য যারা নিয়ত চেষ্টা করছে হঠাৎ তাদের মধ্যে মুষলপর্ব কেন দেখা দিলে? পূর্বে বলেছি, মানুষের সত্য হচ্ছে, আপনাকে অনেকের মধ্যে লাভ করলে তবেই সে আপনাকে লাভ করে। এতদিন ছোটো সীমার মধ্যে এই সত্য কাজ করছিল। ভৌগোলিক বেষ্টন যতদিন পর্যন্ত সত্য ছিল ততদিন সেই বেষ্টনের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি আপনার জাতির সকলের সঙ্গে মিলনে নিজেকে সত্য বলে অনুভব করার দ্বারা বড়ো হয়েছে। কিন্তু বর্তমান যুগে সে বেড়া ভেঙে গেছে; জলে স্থলে দেশে দেশে যেসকল বাধা মানুষকে বাহির থেকে বিভক্ত করেছিল সেসব ক্রমশ অপসারিত হচ্ছে। আজ আকাশপথে

পর্যন্ত মানুষ চলাচল করছে। আকাশযানের উৎকর্ষ ক্রমে ঘটবে, তখন পৃথিবীর সমস্ত স্থূল বাধা মানুষ ডিঙিয়ে চলে যাবে, দেশগত সীমানার কোনো অর্থই থাকবে না।

ভূগোলের সীমা ক্ষীণ হয়ে মানুষ পরস্পরের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এতবড়ো সত্যটা আজও বাহিরের সত্য হয়েই রইল, মনের ভিতরে এ সত্য স্থান পেলে না। পুরাতন যুগের অভ্যাস আজও তাকে জড়িয়ে আছে, সে যে-সাধনার পাথেয় নিয়ে পথে চলতে চায় তা অতীত যুগের জিনিস; সুতরাং তা বর্তমান যুগের সামনের পথে চলবার প্রতিকূলতা করতে থাকবে।

বর্তমান যুগে যে-সত্যের আবির্ভাব হয়েছে তার কাছে সত্যভাবে না গেলে মার খেতে হবে। তাই আজ মারামারি বেধেছে— নানা জাতির মিলনের ক্ষেত্রেও আনন্দ নেই, শান্তি নেই। কাটাকাটি মারামারি সন্দেহ হিংসা যে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছে তাতেই বুঝছি যে, সত্যের সাধনা হচ্ছে না। যে সত্য আজ মানবসমাজদ্বারে অতিথি তাঁর অভ্যর্থনার সাধনা বিশ্বভারতী গ্রহণ করেছে।

দারিদ্র্য যতই হোক, বাইরে থেকে দুর্গতি তার যতই হোক, এই ভার নেবার অধিকার ভারতবর্ষের আছে। এ কথা আজ বোলো না, 'তুমি দরিদ্র পরাধীন, তোমার মুখে এসব কথা কেন?' আমাদেরই তো এই কথা। ধনের গৌরব তো এ সত্যকে স্বীকার করতে চায় না। ধনসম্পদ তো ভেদ সৃষ্টি করে, সত্যসম্পদই ভেদকে

অতিক্রম করবার শক্তি রাখে। ধনকে যে মানুষ চরম আশ্রয় বলে বিশ্বাস করে না, যে মৈত্রেয়ীর মতো বলতে পেরেছে, যেনাহং নামৃতাস্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্, সেই তো ধনঞ্জয়, সেই তো ধনের বেড়া ভেঙে মানবাত্মার অধিকারকে সর্বত্র উদ্‌ঘাটিত করতে পারে। সেই অধিকারকে বিশ্বভারতী স্বীকার করুক। দেশবিদেশের তাপস এই বিশ্বভারতীতে আসন গ্রহণ করুন। আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা, এই কথা আমরা আশ্রমে বসে বলব। ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিক ঐক্যসাধনায় যে তপস্যা করেছেন সেই তপস্যাকে এই আধুনিক যুগের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে তবেই আমাদের সমস্ত অগৌরব দূর হবে— বাণিজ্য করে নয়, লড়াই করে নয়, সত্যকে স্বীকার করার দ্বারাই তা হবে। মনুষ্যত্বের সেই পূর্ণগৌরবসাধনের আয়োজনে বিশ্বভারতী আজ হতে নিযুক্ত হোক, এই আমাদের সংকল্প।

১ ভাদ্র ?, ১৩২৯

কলিকাতা

৬

বিশ্বভারতী সম্বন্ধে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, আমার মনে এর ভাবটি সংকল্পটি কোনো একটি বিশেষ সময়ে যে ভেবেচিন্তে উদিত হয়েছে এমন নয়। এই সংকল্পের বীজ আমার মগ্ন চৈতন্যের মধ্যে নিহিত ছিল, তা ক্রমে অগোচরে অঙ্কুরিত হয়ে জেগে উঠেছে। এর কারণ আমার নিজের জীবনের মধ্যেই রয়েছে। বাল্যকাল থেকে আমি যে জীবন অতিবাহিত করে এসেছি তার ভিতর থেকে এই প্রতিষ্ঠানের আদর্শটি জাগ্রত হয়ে উঠেছে।

আপনারা জানেন যে, আমি যথোচিতভাবে বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থার সঙ্গে যোগ রক্ষা করে চলি নি। আমার পরিবারে আমি যে ভাবে মানুষ হয়েছি তাতে করে আমাকে সংসার থেকে দূরে নিয়ে গিয়েছিল, আমি একান্তবাসী ছিলাম। মানবসমাজের সঙ্গে আমার বাল্যকাল থেকে ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল না, আমি তার প্রান্তে মানুষ হয়েছি। 'জীবনস্মৃতি'তে এর বিবরণ পড়ে থাকবেন। আমি সমাজের থেকে দূরে বাস করতুম বলে তার দিকে বাতায়নের পথ দিয়ে দৃষ্টিপাত করেছি। তাই আমার কাছে দূরের দুর্লভ জিনিসের প্রতি আকর্ষণ খুব গভীর ছিল। কলকাতা শহরে আমার বাস ছিল, কাজেই ইঁটকাঠপাথরের মধ্যে আমার গতিবিধি সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ ছিল। আমাদের চারি দিকেই

বাড়িগুলি মাথা তুলে থাকত, আর তাদের মাঝখানে অল্প পরিধির মধ্যে সামান্য কয়েকটি গাছপালা আর একটি পুষ্করিণী ছিল। কিন্তু দূরে আমাদের পাড়ার বাইরে বেশি বড়ো বাড়ি ছিল না, একটু পাড়াগাঁ গোছের ভাব ছিল।

সে সময় আমাকে বাইরের প্রকৃতি ডাক দিয়েছিল। মনে আছে মধ্যাহ্নে লুকিয়ে একলা ছাদের কোণটি গ্রহণ করতুম। উন্মুক্ত নীলাকাশ, চিলের ডাক, আর পাড়ার গলির জনতার বিচিত্র ছোটো ছোটো কলধ্বনির মধ্য দিয়ে বাড়ির ছাদের উপর থেকে যে জীবনযাত্রার খণ্ড খণ্ড ছবি পেতুম তা আমার হৃদয়কে আলোড়িত করেছিল। এর মধ্যে মানবপ্রকৃতিরও একটা ডাক ছিল। দূর থেকে কখনও-বা লোকালয়ের উপর রাত্রের ঘুম-পাড়ানো সুর, কখনও-বা প্রভাতের ঘুম-জাগানো গান, আর উৎসব-কোলাহলের নানারকম ধ্বনি আমার হৃদয়কে উতলা করে দিয়েছিল। বর্ষার নবমেঘাগমে আকাশের লীলাবৈচিত্র্য আর শরতের শিশিরে ছোটো বাগানটিতে ঘাস ও নারিকেল-রাজির ঝলমলানি আমার কাছে অপূর্ব হয়ে দেখা দিত। মনে আছে অতি প্রত্যুষে সূর্যোদয়ের আবির্ভাবের সঙ্গে তাল রাখবার জন্য তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে তার অপেক্ষা করেছি। সকালের সেই শিশিরের উপর সোনার আলো আমার হৃদয়ে নিবিড় গভীর আনন্দবেদনার সঞ্চার করেছে। বিশ্বজগৎ যেন আমাকে বার বার করে আহ্বান করে বলেছে, 'তুমি আমার আপনার। আমার মধ্যে যে সত্য

আছে তা সকলের সঙ্গে যোগের প্রতীক্ষা রাখে, কিন্তু তবুও তোমায়-আমায় এই বিরহের মধ্যেও মাধুর্য রয়েছে।' তখনও এই বহির্বিশ্বের উপলব্ধি আমার মনের ভিতরে অস্পষ্টভাবে ঘনিয়ে উঠেছে। ছোটো ঘরের ভিতরকার মানুষটিকে বাইরের ডাক গভীরভাবে মুগ্ধ করেছিল।

তার পর আমার মনে আছে যে, প্রথম যখন আমাদের শহরে ডেঙ্গুজ্বর দেখা দিল, এই ব্যাধি আমার কাছে বেরিয়ে পড়ার মস্ত সুযোগের মতো এল। গঙ্গার ধারে পেনেটির বাগানে আমরা বাস করতে লাগলুম। এই প্রথম অপেক্ষাকৃত নিকটভাবে প্রকৃতির স্পর্শ পেলাম। এ যে কত মনোহর তা ব্যক্ত করতে পারি না। আপনারা অনেকে পল্লীগ্রাম থেকে আসছেন, অনেকেরই পল্লীর সঙ্গে অতিনিকট সম্বন্ধ। আপনারা তার শ্যামল শস্যক্ষেত্র ও বনরাজি দেখে থাকবেন, কিন্তু আমার মনোভাব ঠিক উপলব্ধি করতে পারবেন না। ইঁটকাঠের কারাগার থেকে বহিরাকাশে মুক্তি পেয়ে প্রকৃতির সঙ্গে সেই প্রথম পরিচয় লাভ করা যে কত মূল্যবান তা আমার জীবনে যেমন বুঝেছিলুম অল্প লোকের ভাগ্যেই তা ঘটে। সকালে কুঠির পানশি দক্ষিণ দিকে যেত, সন্ধ্যায় তা উত্তরগামী হত। নদীর দু ধারে এই জনতার ধারা, জলের সঙ্গে মানুষের এই জীবনযাত্রার যোগ, গ্রামবাসীদের এই স্নান পান তর্পণ, এইসকল দৃশ্য আমার অন্তরকে স্পর্শ করেছিল। গ্রামগুলি যেন গঙ্গার দুই পারকে আঁকড়ে রয়েছে, পিপাসার জলকে

স্তন্যরসের মতো গ্রহণ করে নিয়েছে। আমার গঙ্গার ধারে এই প্রথম যাওয়া। আর সে সময়ে সেখানকার সূর্যের উদয়াস্ত যে আমার কাছে কী অপরূপ লেগেছিল তা কী বলব। এই যে বিশ্বজগতে প্রতি মুহূর্তে অনির্বচনীয় মহিমা উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে আমরা তার সঙ্গে যুক্ত থাকলেও অতি-পরিচয়ের জন্য তা আমাদের কাছে ম্লান হয়ে যায়। ওঅর্ড্‌স্‌ওঅর্থের কবিতায় আপনারা তার উল্লেখ দেখেছেন। কেজো মানুষের কাছে বিশ্বপ্রকৃতির অপূর্বতা একেবারে 'না' হয়ে গেছে, নেই বললেই হয়। তার রহস্য মাধুর্য তার মনে তেমন সাড়া দেয় না। আকাশে দিনের পর দিন যেন আশ্চর্য একটি কাব্যগ্রন্থের পাতার পর পাতা উদ্‌ঘাটন করে বিশ্বকবির মর্মকথাটি বার বার প্রকাশ করতে থাকে। আমরা মাঝখান থেকে অতিপরিচয়ের অন্তরালে তার রস থেকে বঞ্চিত হই। তাই প্রকৃতির রসধারার স্পর্শে আমার মন সে সময়ে যেরকম উৎসুক হয়ে উঠেছিল আজও তার প্রবলতা ক্ষীণ হয়ে যায় নি, এ কথাটা বলার দরকার আছে। এতটা আমি ভূমিকা-স্বরূপ বললুম। যে যে ঘটনা আমার জীবনকে নানা সম্পর্কের মধ্য দিয়ে একটা বিশেষ দিকে চালনা করছিল এই সময়কার জীবনযাত্রা তার মধ্যে সর্বপ্রধান ব্যাপার।

এমনি আর-একটি অনুকূল ঘটনা ঘটল যখন আমি পদ্মা-নদীর তীরে গিয়ে বাস করতে লাগলুম। পদ্মাতটের সেই আম জাম ঝাউ বেত আর শর্ষের খেত, ফাল্গুনের মৃদু

সৌগন্ধে ভারাক্রান্ত বাতাস, নির্জন চরে কলধ্বনিমুখরিত বুনো হাঁসের বসতি, সন্ধ্যাতারায়-জ্বলজ্বল-করা নদীর স্বচ্ছ গভীরতা, এসব আমার সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তা স্থাপন করেছিল। তখন পল্লীগ্রামে মানুষের জীবন ও প্রকৃতির সৌন্দর্যে সম্মিলিত জগতের সঙ্গে পরিচয় লাভ করে আমার গভীর আনন্দ পাবার উপলক্ষ হয়েছিল।

অল্প বয়সে আমি আর-একটি জিনিস পেয়েছি। মানুষের থেকে দূরে বাস করলেও এবং উন্মুক্ত প্রকৃতির কোল থেকে বিচ্ছিন্নভাবে কাটিয়ে থাকলেও আমি বাড়িতে আত্মীয়-বন্ধুদের সংগীত সাহিত্য শিল্পকলার চর্চার আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ হয়েছি। এটি আমার জীবনের খুব বড়ো কথা। আমি শিশুকাল থেকে পলাতক ছাত্র। মাস্টারকে বরাবর ভয় করে এড়িয়ে চলেছি। কিন্তু বিশ্বসংসারের যেসকল অদৃশ্য মাস্টার অলক্ষ্যে থেকে পাঠ শিখিয়ে দেন তাঁদের কাছে কোনোরকমে আমি পড়া শিখে নিয়েছি। আমাদের বাড়িতে নিয়ত ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্যের ও সংগীতের আলোচনা হত, আমি এসবের মধ্যে বেড়ে উঠেছি। এইসকল বিদ্যা যথার্থভাবে শিক্ষালাভ না করলেও এ থেকে ভিতরে ভিতরে আশপাশ হতে নানা উপায়ে মনে মনে আনন্দরস সঞ্চয় করতে পেরেছি। আমার বড়দাদা তখন 'স্বপ্নপ্রয়াণ' লিখতে নিরত ছিলেন। বনস্পতি যেমন স্বচ্ছন্দে প্রচুর ফুল ফুটিয়ে ফল ধরিয়ে ইতস্তত বিস্তর খসিয়ে ঝরিয়ে ফেলে দেয়, তাতে তার কোনো

অনুশোচনা নেই ; তেমনি তিনি খাতায় যতটি লেখা রক্ষা করতেন তার চেয়ে ছেঁড়া কাগজে বাতাসে ছড়াছড়ি যেত অনেক বেশি। আমাদের চলাফেরার রাস্তা সেইসব বিক্ষিপ্ত ছিন্নপত্রে আকীর্ণ হয়ে গেছে। সেইসকল অবারিত সাহিত্যরচনার ছিন্নপত্রের স্তূপ আমার চিত্তধারায় পলি-মাটির সঞ্চয় রেখে দিয়ে গিয়েছিল।

তার পর আপনারা জানেন, আমি খুব অল্পবয়স থেকেই সাহিত্যচর্চায় মন দিয়েছি, আর তাতে করে নিন্দা খ্যাতি যা পেয়েছি তারই মধ্য দিয়ে লেখনী চালিয়ে গিয়েছি। তখন একটি বড়ো সুবিধা ছিল যে, সাহিত্য-ক্ষেত্রে এত প্রকাশ্যতা ছিল না, সাহিত্যের এত বড়ো বাজার বসে নি, ছোটো হাটেই পশরা দেওয়া-নেওয়া চলত। তাই আমার বাল্যরচনা আপন কোণটুকুতে কোনো লজ্জা পায় নি। আত্মীয়বন্ধুদের যা একটু-আধটু প্রশংসা ও উৎসাহ লাভ করেছি তাই যথেষ্ট মনে করেছি। তার পর ক্রমে বঙ্গসাহিত্যের প্রসার হল, তার চর্চা ব্যাপকতা লাভ করল। সাহিত্যক্ষেত্র জনতায় আক্রান্ত হল। দেখতে দেখতে রাত্রির আকাশে তারার আবির্ভাবের মতো সাহিত্যাকাশ অসংখ্য লেখকের দ্বারা খচিত হয়ে দেখা দিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমার সাহিত্যচর্চার মধ্যে বরাবর সেই নির্জনতাই ছিল। এই বিরলবাসই আমার একান্ত আপনার জিনিস ছিল। অতিরিক্ত প্রকাশ্যতার আঘাতে আমি কখনও সুস্থ বোধ করি নি। আমি

চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর পর্যন্ত পদ্মাতীরের নিরালা আবাস-টিতে আপন খেয়ালে সাহিত্যরচনা করেছি। আমার কাব্য-সৃষ্টির যা-কিছু ভালো-মন্দ তা সে সময়েই লেখা হয়েছে।

যখন এমনি সাহিত্যের মধ্যে নিবিষ্ট হয়ে কাল কাটাচ্ছি তখন আমার অন্তরে একটি আহ্বান একটি প্রেরণা এল যার জন্য বাইরে বেরিয়ে আসতে আমার মন ব্যাকুল হল। যে কর্ম করবার জন্য আমার আকাঙ্ক্ষা হল তা হচ্ছে শিক্ষাদানকার্য। এটা খুব বিস্ময়কর ব্যাপার, কারণ শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে যে আমার যোগ ছিল না তা তো আগেই বলেছি। কিন্তু এই ভারই যে আমাকে গ্রহণ করতে হল তার কারণ হচ্ছে, আমার মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় ছিল যে, আমাদের শিক্ষাপ্রণালীতে গুরুতর অভাব রয়েছে, তা দূর না হলে শিক্ষা আমাদের জীবন থেকে স্বতন্ত্র হয়ে সম্পূর্ণ বাইরের জিনিস হয়ে থাকবে। আমি এ কথা বলছি না যে, এই গুরুতর অভাব শুধু আমাদের দেশেই আছে— সকল দেশেই ন্যূনাধিক পরিমাণে শিক্ষা সর্বাঙ্গীণ হতে পারছে না— সর্বত্রই বিদ্যাশিক্ষাকে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে অ্যাবস্ট্রাক্ট ব্যাপার করে ফেলা হয়।

তখন আমার মনে একটি দূরকালের ছবি জেগে উঠল। যে তপোবনের কথা পুরাণকথায় পড়া যায় ইতিহাস তাকে কতখানি বাস্তব সত্য বলে গণ্য করবে জানি না, কিন্তু সে বিচার ছেড়ে দিলেও একটা কথা আমার নিজের মনে হয়েছে যে, তপোবনের শিক্ষাপ্রণালীতে খুব একটি বড়ো

সত্য আছে। যে বিরাট বিশ্বপ্রকৃতির কোলে আমাদের জন্ম তার শিক্ষকতা থেকে বঞ্চিত বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলে মানুষ সম্পূর্ণ শিক্ষা পেতে পারে না। বনস্থলীতে যেমন এই প্রকৃতির সাহচর্য আছে তেমনি অপর দিকে তপস্বী মানুষের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাসম্পদ সেই প্রকৃতির মাঝখানে বসে যখন লাভ করা যায় তখনই যথার্থ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের মধ্যে বাস করে বিদ্যাকে গুরুর কাছ থেকে পাওয়া যায়। শিক্ষা তখন মানবজীবন থেকে বঞ্চিত হয়ে একান্ত ব্যাপার হয় না। বনের ভিতর থেকে তপোবনের হোম-ধেনু দোহন করে অগ্নি প্রজ্বলিত করে নানা ভাবে প্রকৃতির সঙ্গে নিত্যযুক্ত হয়ে যে জীবনযাপনের ব্যবস্থা প্রাচীন কালে ছিল তার মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ছিল। যাদের গুরুরূপে বরণ করা হয় তাদের সঙ্গে এইরূপ জীবনযাত্রার মধ্য দিয়ে একত্র মানুষ হয়ে ওঠার মধ্যে খুব একটা বড়ো শিক্ষা আছে। এতে করে শিক্ষা ও জীবনের মধ্যে যথার্থ যোগ স্থাপিত হয়, গুরুশিষ্যের সঙ্গে সম্বন্ধ সত্য ও পূর্ণ হয়, বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতির সঙ্গে মিলন মধুর ও স্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠে। তাই আমার মনে হয়েছিল যে, তখনকার দিনে তপোবনের মধ্যে মানবজীবনের বিকাশ একটি সহজ ব্যাপার ছিল বটে, কিন্তু তার সময়টি এখনও উত্তীর্ণ হয়ে যায় নি ; তার মধ্যে যে সত্য ও সৌন্দর্য আছে তা সকল কালের। বর্তমান কালেও তপোবনের জীবন আমাদের আয়ত্তের অগম্য হওয়া উচিত নয়।

এই চিন্তা যখন আমার মনে উদিত হয়েছিল তখন আমি শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনার ভার নিলুম। সৌভাগ্যক্রমে তখন শান্তিনিকেতন আমার পক্ষে তপোবনের ভাবে পূর্ণ ছিল। আমি বাল্যকালে আমার পিতৃদেবের সঙ্গে এখানে কালযাপন করেছি। আমি প্রত্যক্ষভাবে জানি যে, তিনি কী পূর্ণ আনন্দে বিশ্বের সঙ্গে পরমাত্মার সঙ্গে চিত্তের যোগসাধনের দ্বারা সত্যকে জীবনে একান্তভাবে উপলব্ধি করেছেন। আমি দেখেছি যে, এই অনুভূতি তাঁর কাছে বাহিরের জিনিস ছিল না। তিনি রাত্রি দুটোর সময় উন্মুক্ত ছাদে বসে তারাখচিত রাত্রিতে নিমগ্ন হয়ে অন্তরে অমৃতরস গ্রহণ করেছেন, আর প্রতিদিন বেদীতলে বসে প্রাণের পাত্রটি পূর্ণ করে সুধাধারা পান করেছেন। যিনি সমস্ত বিশ্বকে পূর্ণ করে রয়েছেন তাঁকে বিশ্বছবির মধ্যে উপলব্ধি করা, এটি মহর্ষির জীবনে প্রত্যক্ষ সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে। আমার মনে হল যে, যদি ছাত্রদের মহর্ষির সাধনস্থল এই শান্তিনিকেতনে এনে বসিয়ে দিতে পারি তবে তাদের সঙ্গে থেকে নিজের যেটুকু দেবার আছে তা দিতে পারলে বাকিটুকুর জন্য আমাকে ভাবতে হবে না, প্রকৃতিই তাদের হৃদয়কে পূর্ণ করে সকল অভাব মোচন করে দিতে পারবে। প্রকৃতির সঙ্গে এই যোগের জন্য সকলের চিত্তেই যে ন্যূনাধিক ক্ষুধার অংশ আছে তার নিবৃত্তি করবার চেষ্টা করতে হবে, যে স্পর্শ থেকে মানুষ বঞ্চিত হয়েছে তাকে জোগাতে হবে।

তখন আমার সঙ্গী-সহায় খুবই অল্প। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয় আমায় ভালোবাসতেন আর আমার সংকল্পে শ্রদ্ধা করতেন। তিনি আমার কাজে এসে যোগ দিলেন। তিনি বললেন, 'আপনি মাস্টারি করতে না জানেন, আমি সে ভার নিচ্ছি।' আমার উপর ভার রইল ছেলেদের সঙ্গ দেওয়া। আমি সন্ধ্যাবেলায় তাদের নিয়ে রামায়ণ মহাভারত পড়িয়েছি, হাস্য করুণ রসের উদ্রেক করে তাদের হাসিয়েছি কাঁদিয়েছি। তা ছাড়া নানা গল্প বানিয়ে বলতাম, দিনের পর দিন একটি ছোটো গল্পকে টেনে টেনে লম্বা করে পাঁচ-সাত দিন ধরে একটি ধারা অবলম্বন করে চলে যেতাম। তখন মুখে মুখে গল্প তৈরি করবার আমার শক্তি ছিল। এইসব বানানো গল্পের অনেকগুলি আমার 'গল্পগুচ্ছে' স্থান পেয়েছে। এমনি ভাবে ছেলেদের মন যাতে অভিনয়ে গল্পে গানে, রামায়ণ-মহাভারত-পাঠে সরস হয়ে ওঠে তার চেষ্টা করেছি।

আমি জানি, ছেলেদের এমনি ভাবে মনের ধারা ঠিক করে দেওয়া, একটা অ্যাটিচুড তৈরি করে তোলা খুব বড়ো কথা। মানুষের যে এতবড়ো বিশ্বের মধ্যে এত-বড়ো মানবসমাজে জন্ম হয়েছে, সে যে এতবড়ো উত্তরাধিকার লাভ করেছে, এইটার প্রতি তার মনের অভিমুখিতাকে খাঁটি করে তোলা দরকার। আমাদের দেশের এই দুর্গতির দিনে আমাদের অনেকের পক্ষেই শিক্ষার শেষ লক্ষ্য হয়েছে চাকরি, বিশ্বের সঙ্গে যে

আনন্দের সম্বন্ধের দ্বারা বিশ্বসম্পদকে আত্মগত করা যায় তা থেকে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি। কিন্তু মানুষকে আপন অধিকারটি চিনে নিতে হবে। সে যেমন প্রকৃতির সঙ্গে চিত্তের সামঞ্জস্য সাধন করবে তেমন তাকে বিরাট মানব-বিশ্বের সঙ্গে সম্মিলিত হতে হবে।

আমাদের দেশবাসীরা 'ভূমৈব সুখম্' এই ঋষিবাক্য ভুলে গেছে। ভূমৈব সুখং— তাই জ্ঞানতপস্বী মানব দুঃসহ ক্লেশ স্বীকার করেও উত্তর-মেরুর দিকে অভিযানে বার হচ্ছে, আফ্রিকার অভ্যন্তরপ্রদেশে দুর্গম পথে যাত্রা করছে, প্রাণ হাতে করে সত্যের সন্ধানে ধাবিত হচ্ছে। তাই কর্ম জ্ঞান ও ভাবের সাধনপথের পথিকেরা দুঃখের পথ অতিবাহন করতে নিষ্ক্রান্ত হয়েছে; তাঁরা জেনেছেন যে, ভূমৈব সুখং— দুঃখের পথেই মানুষের সুখ। আজ আমরা সে কথা ভুলেছি, তাই অত্যন্ত ক্ষুদ্র লক্ষ্য ও অকিঞ্চিৎকর জীবনযাত্রার মধ্যে আত্মাকে প্রচ্ছন্ন করে দিয়ে দেশের প্রায় সকল লোকেরই কাল কাটছে।

তাই শিক্ষালয় স্থাপন করবার সময়ে প্রথমেই আমার এ কথা মনে হল যে, আমাদের ছাত্রদের জীবনকে মানসিক ক্ষীণতা থেকে ভীরুতা থেকে উদ্ধার করতে হবে। যে গঙ্গার ধারা গিরিশিখর থেকে উত্থিত হয়ে দেশদেশান্তরে বহমান হয়ে চলেছে মানুষ তার জলকে সংসারের ছোটো বড়ো সকল কাজেই লাগাতে পারে। তেমনি যে পাবনী বিদ্যাধারা কোনো উত্তুঙ্গ মানবচিত্তের উৎস থেকে উদ্ভূত

হয়ে অসীমের দিকে প্রবাহিত হয়ে চলছে, যা পূর্ব-পশ্চিম-বাহিনী হয়ে দিকে দিকে নিরন্তর স্বতঃ-উৎসারিত হচ্ছে, তাঁকে আমরা ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির পরিধির মধ্যে বাঁধ বেঁধে ধরে রেখে দেখব না ; কিন্তু যেখানে তা পূর্ণ মানবজীবনকে সার্থক করে তুলেছে, তার সেই বিরাট বিশ্বরূপটি যেখানে পরিস্ফুট হয়েছে সেখানে আমরা অবগাহন করে শুদ্ধ নির্মল হব।

'স তপোঽতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ।' সৃষ্টিকর্তা তপস্যা করছেন, তপস্যা করে সমস্ত সৃজন করছেন। প্রতি অণুপরমাণুতে তাঁর সেই তপস্যা নিহিত। সেজন্য তাদের মধ্যে নিরন্তর সংঘাত, অগ্নিবেগ, চক্রপথের আবর্তন। সৃষ্টিকর্তার এই তপঃসাধনার সঙ্গে সঙ্গে মানুষেরও তপস্যার ধারা চলেছে, সেও চুপ করে বসে নেই। কেননা মানুষও সৃষ্টিকর্তা, তার আসল হচ্ছে সৃষ্টির কাজ। সে যে সংগ্রহ করে সঞ্চয় করে এই তার বড়ো পরিচয় নয়, সে ত্যাগের দ্বারা প্রকাশ করে এই তার সত্য পরিচয়। তাই বিধাতার এই বিশ্বতপঃক্ষেত্রে তারও তপঃসাধনা। মানুষ হচ্ছে তপস্বী, এই কথাটি উপলব্ধি করতে হবে। উপলব্ধি করতে হলে সকল কালের সকল দেশের তপস্যার প্রয়াসকে মানবের সত্য ধর্ম বলে বড়ো করে জানতে হবে।

আজকার দিনে যে তপঃক্ষেত্রে বিশ্বের সর্ব জাতির ও সর্ব দেশের মানবের তপস্যার আসন পাতা হয়েছে আমাদেরও সকল ভেদবুদ্ধি ভুলে গিয়ে সেখানে পৌঁছতে

হবে। আমি যখন বিশ্বভারতী স্থাপিত করলুম তখন এই সংকল্পই আমার মনে কাজ করছিল। আমি বাঙালি বলে আমাদের সাহিত্যরসের চর্চা কেবল বাংলাসাহিত্যের মধ্যেই পরিসমাপ্ত হবে? আমি কি বিশ্বসংসারে জন্মাই নি? আমারই জন্য জগতের যত দার্শনিক যত কবি যত বৈজ্ঞানিক তপস্যা করছেন, এর যথার্থোপলব্ধির মধ্যে কি কম গৌরব আছে?

আমার মুখে এই কথা অহমিকার মতো শোনাতে পারে। আজকের কথাপ্রসঙ্গে তবু আমার বলা দরকার যে, য়ুরোপে আমি যে সম্মান পেয়েছি তা রাজামহারাজারা কোনো কালে পায় নি। এর দ্বারা একটা কথার প্রমাণ হচ্ছে যে, মানুষের অন্তরপ্রদেশের বেদনা-নিকেতনে জাতি-বিচার নেই। আমি এমন-সব লোকের কাছে গিয়েছি যাঁরা মানুষের গুরু, কিন্তু তাঁরা স্বচ্ছন্দে নিঃসংকোচে এই পূর্বদেশবাসীর সঙ্গে শ্রদ্ধার আদানপ্রদান করেছেন। আমি কোথায় যে মানুষের মনে সোনার কাঠি ছোঁয়াতে পেরেছি, কেন যে য়ুরোপের মহাদেশ-বিভাগে এরা আমাকে আত্মীয়রূপে সমাদর করেছে, সে কথা ভেবে আমি নিজেই বিস্মিত হই। এমনি ভাবেই স্যর জগদীশ বসুও যেখানে নিজের মধ্যে সত্যের উৎসধারার সন্ধান পেয়েছেন এবং তা মানুষকে দিতে পেরেছেন সেখানে সকল দেশের জ্ঞানীরা তাঁকে আপনার বলেই অভ্যর্থনা করে নিয়েছেন।

বিশ্বভারতী

পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে নিরন্তর বিদ্যার সমাদর হচ্ছে। ফরাসি ও জর্মনদের মধ্যে বাইরের ঘোর রাষ্ট্রনৈতিক যুদ্ধ বাধলেও উভয়ের মধ্যে বিদ্যার সহযোগিতার বাধা কখনও ঘটে নি। আমরাই কেন শুধু চিরকেলে 'স্কুলবয়' হয়ে একটু একটু করে মুখস্থ করে পাঠ শিখে নিয়ে পরীক্ষার আসরে নামব, তার পর পরীক্ষাপাশ করেই সব বিস্মৃতির গর্ভে ডুবিয়ে বসে থাকব? কেন সকল দেশের তাপসদের সঙ্গে আমাদের তপস্যার বিনিময় হবে না? এই কথা মনে রেখেই আমি বিশ্বভারতীতে আমাদের সাধনার ক্ষেত্রে য়ুরোপের অনেক মনস্বী ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ করেছিলুম। তাঁরা একজনও সেই আমন্ত্রণের অবজ্ঞা করেন নি। তাঁদের মধ্যে একজনের সঙ্গে অন্তত আমাদের চাক্ষুষ পরিচয়ও হয়েছে। তিনি হচ্ছেন প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ ফরাসি পণ্ডিত সিল্‌ভ্যাঁ লেভি। তাঁর সঙ্গে যদি আপনাদের নিকটসম্বন্ধ ঘটত তা হলে দেখতেন যে, তাঁর পাণ্ডিত্য যেমন অগাধ তাঁর হৃদয় তেমনি বিশাল। আমি প্রথমে সংকোচের সঙ্গে অধ্যাপক লেভির কাছে গিয়ে আমার প্রস্তাব জানালুম। তাঁকে বললুম যে আমার ইচ্ছা যে, ভারতবর্ষে আমি এমন বিদ্যাক্ষেত্র স্থাপন করি যেখানে সকল পণ্ডিতের সমাগম হবে, যেখানে ভারতীয় সম্পদের একত্র-সমাবেশের চেষ্টা হবে। সে সময় তাঁর হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বক্তৃতা দেবার নিমন্ত্রণ এসেছিল। হার্ভার্ড পৃথিবীর বড়ো বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে অন্যতম। কিন্তু আমাদের বিশ্ব-

ভারতীর নামধাম কেউ জানে না ; অথচ এই অখ্যাতনামা আশ্রমের আতিথ্য লেভি-সাহেব অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করলেন।

আপনারা মনে করবেন না যে তিনি এখানে এসে শ্রদ্ধা হারিয়েছেন। তিনি বার বার বলেছেন, 'এ যেন আমার পক্ষে স্বর্গে বাস।' তিনি যেমন বড়ো পণ্ডিত ছিলেন, তাঁর তদনুরূপ যোগ্য ছাত্র যে অনেক পাওয়া গিয়েছিল তাও বলা যায় না, কিন্তু তিনি অবজ্ঞা করেন নি, তিনি ভাবের গৌরবেই কর্মগৌরব অনুভব করেছেন ; তাই এখানে এসে তৃপ্ত হতে পেরেছেন। এই প্রসঙ্গে আপনাদের এই সংবাদ জানা দরকার যে, ফ্রান্স জর্মনি সুইজারল্যাণ্ড অস্ট্রিয়া বোহিমিয়া প্রভৃতি য়ুরোপীয় দেশ থেকে অজস্র পরিমাণ বই দানরূপে শান্তিনিকেতন লাভ করেছে।

বিশ্বকে সহযোগীরূপে পাবার জন্য শান্তিনিকেতনে আমরা সাধ্যমত আসন পেতেছি, কিন্তু এক হাতে যেমন তালি বাজে না তেমনি এক পক্ষের দ্বারা এই চিত্তসমবায় সম্ভবপর হয় না। যেখানে ভারতবর্ষ এক জায়গায় নিজেকে কোণঠেসা করে রেখেছে সেখানে কি সে তার রুদ্ধ দ্বার খুলবে না ? ক্ষুদ্র বুদ্ধির দ্বারা বিশ্বকে একঘরে করে রাখার স্পর্ধাকে নিজের গৌরব বলে জ্ঞান করবে ?

আমার ইচ্ছা বিশ্বভারতীতে সেই ক্ষেত্রটি তৈরি হয় যেখানে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের সম্বন্ধ স্বাভাবিক কল্যাণজনক ও আত্মীয়জনোচিত হয়। ভারতবর্ষকে অনুভব করতে হবে

যে, এমন একটি জায়গা আছে যেখানে মানুষকে আত্মীয় বলে গ্রহণ করাতে অগৌরব বা দুঃখের কারণ নেই, যেখানে মানুষের পরস্পরের সম্পর্কটি পীড়াজনক নয়। আমার পাশ্চাত্য বন্ধুরা আমাকে কখনও কখনও জিজ্ঞাসা করেছেন, 'তোমাদের দেশের লোকে কি আমাদের গ্রহণ করবে?' আমি তার উত্তরে জোরের সঙ্গে বলেছি, 'হ্যাঁ নিশ্চয়ই, ভারতীয়েরা আপনাদের কখনও প্রত্যাখ্যান করবে না।' আমি জানি যে, বাঙালির মনে বিদ্যার গৌরববোধ আছে, বাঙালি পাশ্চাত্যবিদ্যাকে অস্বীকার করবে না। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নানা ভেদ ও মতবাদ সত্ত্বেও ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলাদেশেই সর্বদেশীয় বিদ্যার প্রতি শ্রদ্ধা বাঙালির রক্তের জিনিস হয়ে গেছে। যারা অতি দরিদ্র, যাদের কষ্টের সীমা নেই, তারাও বিদ্যাশিক্ষার দ্বারা ভদ্র পদবী লাভ করবে বলে আকাঙ্ক্ষা বাংলাদেশেই করে। বাঙালি যদি শিক্ষিত না হতে পারে তবে সে ভদ্রসমাজেই উঠতে পারল না। তাই তো বাঙালির বিধবা মা ধান ভেনে সুতো কেটে প্রাণপাত করে ছেলেকে শিক্ষা দিতে ব্যগ্র হয়। তাই আমি মনে করেছিলুম যে, বাঙালি বিদ্যা ও বিদ্বানকে অবজ্ঞা করবে না; তাই আমি পাশ্চাত্য জ্ঞানীদের বলে এসেছিলাম যে, 'তোমরা নিঃসংকোচে নির্ভয়ে আমাদের দেশে আসতে পার, তোমাদের অভ্যর্থনার ত্রুটি হবে না।'

আমার এই আশ্বাসবাক্যের সত্য পরীক্ষা বিশ্বভারতীতেই হবে। আশা করি এইখানে আমরা প্রমাণ

করতে পারব যে, বৃহৎ মানবসমাজে যেখানে জ্ঞানের যজ্ঞ চলছে সেখানে সত্যহোমানলে আহুতি দেবার অধিকার আমাদেরও আছে ; সমস্ত দেশ ও কালের জ্ঞানসম্পদ আমরা আপনার বলে দাবি করতে পারি এই গৌরব আমাদের। মানুষের হাত থেকে বর ও অর্ঘ্য গ্রহণের যে স্বাভাবিক অধিকার প্রত্যেক মানুষেরই আছে কোনো মোহবশত আমরা তার থেকে লেশমাত্র বঞ্চিত নই। আমাদের মধ্যে সেই বর্বরতা নেই যা দেশকালপাত্রনিরপেক্ষ জ্ঞানের আলোককে আত্মীয়রূপে স্বীকার করে না, তাকে অবজ্ঞা করে লজ্জা পায় না, প্রত্যাখ্যান করে নিজের দৈন্য অনুভব করতে পারে না।

৪ ভাদ্র ১৩২৯

কলিকাতা

৭

প্রত্যেক মুহূর্তেই আমাদের মধ্যে একটি প্রেরণা আছে নিজেকে বিকশিত করবার। বিকাশই হচ্ছে বিশ্বজগতের গোড়াকার কথা। সৃষ্টির যে লীলা, তার এক দিকে আবরণ আর-এক দিকে প্রকাশ। প্রকাশের যে আনন্দ, দেশকালের মধ্যে দিয়ে সে আপন আবরণ মোচনের দ্বারা আপনাকে উপলব্ধি করছে। উপনিষদ বলছেন—'হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্,' হিরণ্ময় পাত্রের দ্বারা সত্যের মুখ আবৃত হয়ে আছে। কিন্তু একান্তই যদি আবৃত হয়ে থাকত তা হলে পাত্রকেই জানতুম, সত্যকে জানতুম না। সত্য যে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে এ কথা বলবারও জোর থাকত না। কিন্তু যেহেতু সৃষ্টির প্রক্রিয়াই হচ্ছে সত্যের প্রকাশের প্রক্রিয়া সেইজন্যে উপনিষদের ঋষি মানুষের আকাঙ্ক্ষাকে এমন করে বলতে পেরেছেন, 'হে সূর্য, তোমার আলোকের আবরণ খোলো, আমি সত্যকে দেখি।'

মানুষ যে এমন কথা বলতে পেরেছে তার কারণ এই, মানুষ নিজের মধ্যে দেখছে যে, প্রত্যক্ষ যে অবস্থার মধ্যে সে বিরাজমান সেইটেই তার চরম নয়। তার লোভ আছে এবং লোভ চরিতার্থ করবার প্রবল বাসনা আছে; কিন্তু তার অন্তরাত্মা বলছে, লোভের আবরণ থেকে মনুষ্যত্বকে মুক্তি দিতে চাই। অর্থাৎ যে পদার্থটা তার

মধ্যে অতিরিক্তমাত্রায় প্রবল হয়ে আছে সেটাকে সে আপন মনুষ্যত্বের প্রকাশ বলে স্বীকার করে না, বাধা বলেই স্বীকার করে। যা আছে তাই সত্য, যা প্রতীয়মান তাই প্রতীতির যোগ্য, মানুষ এ কথা বলে নি। পশুবৎ বর্বর মানুষের মধ্যে বাহুশক্তি যতই প্রবল থাক্, তার সত্য যে ক্ষীণ অর্থাৎ তার প্রকাশ যে বাধাগ্রস্ত এ কথা মানুষ প্রথম থেকেই কোনোরকম করে উপলব্ধি করেছিল বলেই সে যাকে সভ্যতা বলে সে পদার্থটা তার কাছে নিরর্থক হয় নি।

সভ্যতা-শব্দটার আসল মানে হচ্ছে, সভার মধ্যে আপনাকে পাওয়া, সকলের মধ্যে নিজেকে উপলব্ধি করা। সভা-শব্দের ধাতুগত অর্থ এই যে, যেখানে আভা যেখানে আলোক আছে। অর্থাৎ মানুষের প্রকাশের আলো একলা নিজের মধ্যে নয়, সকলের সঙ্গে মিলনে। যেখানে এই মিলনতত্ত্বের যতটুকু খর্বতা সেইখানেই মানুষের সত্য সেই পরিমাণেই আচ্ছন্ন। এইজন্যেই মানুষ কেবলই আপনাকে আপনি বলছে— 'অপাবৃণু', খুলে ফেলো, তোমার একলা-আপনের ঢাকা খুলে ফেলো, তোমার সকল-আপনের সত্যে প্রকাশিত হও; সেইখানেই তোমার দীপ্তি, সেইখানেই তোমার মুক্তি।

বীজ যখন অঙ্কুররূপে প্রকাশিত হয় তখন ত্যাগের দ্বারা হয়। সে ত্যাগ নিজেকেই ত্যাগ। সে আপনাকে বিদীর্ণ করে তবে আপনার সত্যকে মুক্তি দিতে পারে। তেমনি, যে আপন সকলের— তাকে পাবার জন্যে মানুষেরও ত্যাগ

করতে হয় যে আপন তার একলার, তাকে। এইজন্যে ঈশোপনিষদ বলেছেন, যে মানুষ আপনাকে সকলের মধ্যে ও সকলকে আপনার মধ্যে পায় 'ন ততো বিজুগুপ্সতে'— সে আর গোপন থাকে না। অসত্যে গোপন করে সত্যে প্রকাশ করে। তাই আমাদের প্রার্থনা, 'অসতো মা সদ্‌গময়'— অসত্য থেকে আমাকে সত্যে নিয়ে যাও; 'আবিরাবীর্ম এধি'— হে প্রকাশস্বরূপ, আমার মধ্যে তোমার আবির্ভাব হোক।

তা হলে দেখা যাচ্ছে, প্রকাশ হচ্ছে আপনাকে দান। আপনাকে দিতে গিয়ে তবে আপনাকে প্রকাশ করি, আপনাকে জানতে পাই। আপনাকে দেওয়া এবং আপনাকে জানা একসঙ্গেই ঘটে। নির্বাপিত প্রদীপ আপনাকে দেয় না, তাই আপনাকে পায় না। যে মানুষ নিজেকে সঞ্চয় ক'রে সকলের চেয়ে বড়ো হয় সেই প্রচ্ছন্ন, সেই অবরুদ্ধ; যে মানুষ নিজেকে দান ক'রে সকলের সঙ্গে এক হতে চায় সেই প্রকাশিত, সেই মুক্ত।

সওগাদ, তার উপরে নানা রঙের চিত্র-করা রুমাল ঢাকা। যতক্ষণ রুমাল আছে ততক্ষণ দেওয়া হয় নি, ততক্ষণ সমস্ত জিনিসটা আমার নিজের দিকেই টানা। ততক্ষণ মনে হয়েছে, ঐ রুমালটাই মহামূল্য। ততক্ষণ আসল জিনিসের মানে পাওয়া গেল না, তার দাম বোঝা গেল না। যখন দান করবার সময় এল, রুমাল যখন খোলা গেল, তখনই আসলের সঙ্গে বিশ্বের পরিচয় হল, সব সার্থক হল।

আমাদের আত্মনিবেদন যখন পূর্ণ হয় তখনই নিজেকে সম্পূর্ণ পাই। নইলে আমার আপন-নামক যে বিচিত্র ঢাকাখানা আছে সেইটেই চরম বলে বোধ হয়, সেইটেকেই কোনোরকমে বাঁচাবার প্রাণপণ চেষ্টা মনে জাগতে থাকে। সেইটে নিয়েই যত ঈর্ষা, যত ঝগড়া, যত দুঃখ। যারা মূঢ় তারা সেইটেরই রঙ দেখে ভুলে যায়। নিজের যেটা সত্য রূপ সেইটেই হচ্ছে বিশ্বের সঙ্গে মিলনের রূপ।

আজ নববর্ষের দিন আমাদের আশ্রমের ভিতরকার সত্যকে প্রত্যক্ষ করবার দিন। যে তপস্যা এখানে স্থান পেয়েছে তার সৃষ্টিশক্তিটি কী তা আমাদের জানতে হবে। এর বাইরের একটা ব্যবস্থা আছে, এর ঘরবাড়ি তৈরি হচ্ছে, এর আইনকানুন চলছে, সে আমরা সকলে মিলে গড়ছি। কিন্তু এর নিজের ভিতরকার একটি তত্ত্ব আছে যা নিজেকে নিজে ক্রমশ উদ্‌ঘাটিত করছে, এবং সেই নিয়ত উদ্‌ঘাটিত করার প্রক্রিয়াই হচ্ছে তার সৃষ্টি। তাকে যদি আমরা স্পষ্ট করে দেখতে পাই তা হলেই আমাদের আত্ম-নিবেদনের উৎসাহ সম্পূর্ণ হতে পারে। সত্য যখন আমাদের কাছে অস্পষ্ট থাকে তখন আমাদের ত্যাগের ইচ্ছা বল পায় না।

সত্য আমাদের ত্যাগ করতে আহ্বান করে। কেননা ত্যাগের দ্বারাই আমাদের আত্মপ্রকাশ হয়। আমাদের আশ্রমের মধ্যেও সেই আহ্বান পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে সেই আহ্বানকে আমরা 'বিশ্বভারতী' নাম দিয়েছি।

স্বজাতির নামে মানুষ আত্মত্যাগ করবে এমন একটি আহ্বান কয়েক শতাব্দী ধরে পৃথিবীতে খুব প্রবল হয়ে উঠেছিল। অর্থাৎ স্বজাতিই মানুষের কাছে এতদিন মনুষ্যত্বের সবচেয়ে বড়ো সত্য বলে প্রতীয়মান হয়েছিল। তার ফল হয়েছিল এই যে, এক জাতি অন্য জাতিকে শোষণ করে নিজে বড়ো হয়ে ওঠবার জন্যে পৃথিবী জুড়ে একটা দস্যুবৃত্তি চলছিল। এমনকি যেসব মানুষ স্বজাতির নামে জাল জালিয়াতি অত্যাচার নিষ্ঠুরতা করতে কুণ্ঠিত হয় নি, মানুষ নির্লজ্জভাবে তাদের নামকে নিজের ইতিহাসে সমুজ্জ্বল করে রেখেছে। অর্থাৎ যে ধর্মবিধি সর্বজনীন তাকেও স্বজাতির বেদীর কাছে অপমানিত করা মানুষ ধর্মেরই অঙ্গ বলে মনে করেছে। স্বজাতির গণ্ডিসীমার মধ্যে এই ত্যাগের চর্চা; এর আশুফল খুব লোভনীয় বলেই ইতিহাসে দেখা দিয়েছে। তার কারণ ত্যাগই সৃষ্টিশক্তি; সেই ত্যাগ যতটুকু পরিধির পরিমাণেই সত্য হয় ততটুকু পরিমাণেই সে সার্থকতা বিস্তার করে। এইজন্যে নেশনের ইতিহাসে ত্যাগের দৃষ্টান্ত মহদ্দৃষ্টান্ত বলেই সপ্রমাণ হয়েছে।

কিন্তু সত্যকে সংকীর্ণ করে কখনোই মানুষ চিরকাল সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে না। এক জায়গায় এসে তাকে ঠেকতেই হবে। যদি কেবল উপরিতলের মাটি উর্বরা হয় তবে বনস্পতি দ্রুত বেড়ে ওঠে; কিন্তু অবশেষে তার শিকড় নীরস তলায় গিয়ে ঠেকে, তখন হঠাৎ একদিন তার

ডালপালা মুষড়ে যেতে আরম্ভ করে। মানুষের কর্তব্যবুদ্ধি স্বজাতির সীমার মধ্যে আপন পূর্ণখাদ্য পায় না, তাই হঠাৎ একদিন সে আপনার প্রচুর ঐশ্বর্যের মাঝখানেই দারিদ্র্যে এসে উত্তীর্ণ হয়। তাই যে য়ুরোপ নেশনসৃষ্টির প্রধান ক্ষেত্র সেই য়ুরোপ আজ নেশনের বিভীষিকায় আর্ত হয়ে উঠেছে।

যুদ্ধ এবং সন্ধির ভিতর দিয়ে যে নিদারুণ দুঃখ য়ুরোপকে আলোড়িত করে তুলেছে তার অর্থ হচ্ছে এই যে, নেশন-রূপের মধ্যে মানুষ আপন সত্যকে আবৃত করে ফেলেছে; মানুষের আত্মা বলছে, 'অপাবৃণু'— আবরণ উদ্‌ঘাটন করো। মনুষ্যত্বের প্রকাশ আচ্ছন্ন হয়েছে বলে স্বজাতির নামে পাপাচরণ সম্বন্ধে মানুষ এতদিন এমন স্পষ্ট ঔদ্ধত্য করতে পেরেছে, এবং মনে করতে পেরেছে যে, তাতে তার কোনো ক্ষতি হয় নি, লাভই হয়েছে। অবশেষে আজ নেশন যখন আপনার মুষল আপনি প্রসব করতে আরম্ভ করেছে তখন য়ুরোপে নেশন আপনার মূর্তি দেখে আপনি আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে।

নূতন যুগের বাণী এই যে, আবরণ খোলো, হে মানব, আপন উদার রূপ প্রকাশ করো। আজ নববর্ষের প্রথম দিনে আমাদের আশ্রমের মধ্যে আমরা সেই নবযুগের বাণীকে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করব। আমাদের আশ্রমকে আজ আমরা সর্বপ্রকার ভেদবুদ্ধির আবরণ-মুক্ত করে দেখি, তা হলেই তার সত্যরূপ দেখতে পাব।

বিশ্বভারতী

আমাদের এখানে নানা দেশ থেকে নানা জাতির অতিথি এসেছে। তারা যদি অন্তরের মধ্যে কোনো বাধা না পায় তবে তাদের এই আসার দ্বারাতেই আপনি এখানে নবযুগের একটি মিলনতীর্থ তৈরি হয়ে উঠবে। বাংলাদেশে নানা নদী এসে সমুদ্রে পড়েছে, সেই বহু নদীর সমুদ্রসংগম থেকেই বাংলাদেশ আপনি একটি বিশেষ প্রকৃতি লাভ করে তৈরি হয়ে উঠেছে। আমাদের আশ্রম যদি তেমনি আপন হৃদয়কে প্রসারিত করে দেয় এবং যদি এখানে আগন্তুকেরা সহজেই আপনার স্থানটি পায় তা হলে এই আশ্রম সকলের সেই সম্মিলনের দ্বারা আপনিই আপনার সত্যরূপকে লাভ করবে। তীর্থযাত্রীরা যে ভক্তি নিয়ে আসে, যে সত্যদৃষ্টি নিয়ে আসে, তার দ্বারাই তারা তীর্থস্থানকে সত্য করে তোলে। আমরা যারা এই আশ্রমে এসেছি, আমরা এখানে যে সত্যকে উপলব্ধি করব বলে শ্রদ্ধাপূর্বক প্রত্যাশা করি সেই শ্রদ্ধার দ্বারা সেই প্রত্যাশা দ্বারাই সেই সত্য এখানে সমুজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পাবে। আমরা এখানে কোন্ মন্ত্রের রূপ দেখব বলে নিয়ত প্রত্যাশা করব ? সে মন্ত্র হচ্ছে এই যে— 'যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্'। দেশে দেশে আমরা মানুষকে তার বিশেষ স্বাজাতিক পরিবেষ্টনের মধ্যে খণ্ডিত করে দেখেছি, সেখানে মানুষকে আপন ব'লে উপলব্ধি করতে পারি নে। পৃথিবীর মধ্যে আমাদের এই আশ্রম এমন-একটি জায়গা হয়ে উঠুক যেখানে ধর্ম ভাষা এবং জাতিগত সকলপ্রকার

পার্থক্য সত্ত্বেও আমরা মানুষকে তার বাহ্যভেদমুক্তরূপে মানুষ বলে দেখতে পাই। সেই দেখতে পাওয়াই নূতন যুগকে দেখতে পাওয়া। সন্ন্যাসী পূর্বাকাশে প্রথম অরুণোদয় দেখবে বলে জেগে আছে। যখনই অন্ধকারের প্রান্তে আলোকের আরক্ত রেখাটি দেখতে পায় তখনই সে জানে যে, প্রভাতের জয়ধ্বজা তিমিররাত্রির প্রাকারের উপর আপন কেতন উড়িয়েছে। আমরা তেমনি করে ভারতের এই পূর্বপ্রান্তে এই প্রান্তরশেষে যেন আজ নব-বর্ষের প্রভাতে ভেদবাধার তিমির-মুক্ত মানুষের রূপ আমাদের এখানে সমাগত অতিথি বন্ধু সকলের মধ্যে উজ্জ্বল করে দেখতে পাই। সেই দেখতে পাওয়া থেকেই যেন মনের মধ্যে শ্রদ্ধা করতে পারি যে, মানবের ইতিহাসে নবযুগের অরুণোদয় আরম্ভ হয়েছে।

১ বৈশাখ ১৩৩০

শান্তিনিকেতন

৮

অল্প কিছুকাল হল কালিঘাটে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে আমাদের পুরোনো আদিগঙ্গাকে দেখলাম। তার মস্ত দুর্গতি হয়েছে। সমুদ্রে আনাগোনার পথ তার চিরদিনের মতো বন্ধ হয়ে গেছে। যখন এই নদীটির ধারা সজীব ছিল তখন কত বণিক আমাদের ভারত ছাড়িয়ে সিংহল গুজরাট ইত্যাদি দেশে নিজেদের বাণিজ্যের সম্বন্ধ বিস্তার করেছিল। এ যেন মৈত্রীর ধারার মতো মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের বাধাকে দূর করেছিল। তাই এই নদী পুণ্যনদী বলে গণ্য হয়েছিল। তেমনি ভারতের সিন্ধু ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি যত বড়ো বড়ো নদনদী আছে সবগুলি সেকালে পবিত্র বলে গণ্য হয়েছিল। কেন? কেননা এই নদীগুলি মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ-স্থাপনের উপায়স্বরূপ ছিল। ছোটো ছোটো নদী তো ঢের আছে— তাদের ধারার তীব্রতা থাকতে পারে; কিন্তু না আছে গভীরতা, না আছে স্থায়িত্ব। তারা তাদের জলধারায় এই বিশ্বমৈত্রীর রূপকে ফুটিয়ে তুলতে পারে নি। মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনে তারা সাহায্য করে নি। সেইজন্য তাদের জল মানুষের কাছে তীর্থোদক হল না। যেখান দিয়ে বড়ো বড়ো নদী বয়ে গিয়েছে সেখানে কত বড়ো বড়ো নগর হয়েছে— সেসব দেশ সভ্যতার কেন্দ্রভূমি হয়ে

উঠেছে। এইসব নদী বয়ে মানুষের জ্ঞানের সাধনার সম্পদ নানা জায়গায় গিয়েছে। আমাদের দেশের চতুষ্পাঠিতে অধ্যাপকেরা যখন জ্ঞান বিতরণ করেন, অধ্যাপকপত্নী তাদের অন্নপানের ব্যবস্থা করে থাকেন; এই গঙ্গাও তেমনি একসময়ে যেমন ভারতের সাধনার ক্ষেত্র ধীরে ধীরে বিস্তারিত করেছিল তেমনি আর-এক দিকে দিয়ে সে তার ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর করেছিল। সেইজন্য গঙ্গার প্রতি মানুষের এত শ্রদ্ধা।

তা হলে আমরা দেখলাম, এই পবিত্রতা কোথায়? না, কল্যাণময় আহ্বানে ও সুযোগে মানুষ বড়ো ক্ষেত্রে মানুষের সঙ্গে মিলেছে— আপনার স্বার্থবুদ্ধির গণ্ডির মধ্যে একা একা বদ্ধ হয়ে থাকে নি। এ ছাড়া নদীর জলের মধ্যে এমন কোনো ধর্ম নেই যাতে করে তা পবিত্র হতে পারে।

কিন্তু যখনই তার ধারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হল, সমুদ্রের সঙ্গে তার অবাধ সম্বন্ধ নষ্ট হল, তখনই তার গভীরতাও কমে গেল। গঙ্গা দেখলাম, কিন্তু চিত্ত খুশি হল না। যদিও এখনও লোকে তাকে শ্রদ্ধা করে, সেটা তাদের অভ্যাস-মাত্র। জলে তার আর সেই পুণ্যরূপ নেই। আমাদের ভারতের জীবনেও ঠিক এই দশাই ঘটেছে। এক সময় পৃথিবীর সমস্ত দেশকে ভারত তার পুণ্যসাধনার পথে আহ্বান করেছিল, ভারতে সব দেশ থেকে লোক বড়ো সত্যকে লাভ করার জন্যে এসে মিলেছিল। ভারতও

তখন নিজের শ্রেষ্ঠ যা তা সমস্ত বিশ্বে বিলিয়ে দিয়েছিল। সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে নিজের যোগ স্থাপন করেছিল বলে ভারত পুণ্যক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল। গয়া আমাদের কাছে পুণ্যক্ষেত্র কেন হল? না, তার কারণ বুদ্ধদেব এখানে তপস্যা করেছিলেন, আর সেই তাঁর তপস্যার ফল ভারত সমস্ত বিশ্বে বণ্টন করে দিয়েছে। যদি তার পরিবর্তন হয়ে থাকে, আজ যদি সে আর অমৃত-অন্ন পরিবেশনের ভার না নেয়, তবে গয়াতে আর কিছুমাত্র পুণ্য অবশিষ্ট নেই। কিছু আছে যদি মনে করি তো বুঝতে হবে, তা আমাদের আগেকার অভ্যাস: গয়ার পাণ্ডারা কি গয়াকে বড়ো করতে পারে, না তার মন্দির পারে?

আমাদের এ কথা মনে রাখতে হবে, পুণ্যধর্ম মাটিতে বা হাওয়ায় নেই। চিন্তার দ্বারা, সাধনার দ্বারা পুণ্যকে সমর্থন করতে হবে। আমাদের আশ্রমে সে বাধা অনেক দূর হয়েছে। আপনা-আপনি বিদেশের অতিথিরা এখানে এসে তাঁদের আসন পাতছেন। তাঁরা বলছেন যে, তাঁরা এখানে এসে তৃপ্তি পেয়েছেন। এমনি করেই ভারতের গঙ্গা আমাদের আশ্রমের মধ্যে বইল। দেশবিদেশের অতিথিদের চলাচল হতে লাগল। তাঁরা আমাদের জীবনে জীবন মেলাচ্ছেন। এই আশ্রমকে অবলম্বন করে তাঁদের চিত্ত প্রসারিত হচ্ছে। এর চেয়ে আর সফলতা কিছু নেই। তীর্থে মানুষ উত্তীর্ণ হয় বলেই তার নাম তীর্থ। এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে এসে সকলে উত্তীর্ণ হয় না;

সমস্ত পথিক যেখানে আসে চলে যাবার জন্যে, থাকবার জন্যে নয়। যেমন কলকাতার বড়োবাজার— সেখানে এসে প্রীতি মেলে না, বিরাম মেলে না, সেখানে এসে যাত্রা শেষ হয় না; সেখানে লাভলোকসানের কথা ছাড়া আর কথা নেই। আমি কলকাতায় জন্মেছি— সেখানে আশ্রয় খুঁজে পাচ্ছি না। সেখানে আমার বাড়ি আছে, তবু সেখানে কিছু নিজের আছে বলে মনে করতে পারছি না। মানুষ যদি নিজের সেই আশ্রয়টি খুঁজে না পেলে তো মনুমেণ্ট দেখে, বড়ো বড়ো বাড়িঘর দেখে তার কী হবে। ওখানে কার আহ্বান আছে? বণিকরাই কেবল সেখানে থাকতে পারে। ও তীর্থক্ষেত্র নয়। এ ছাড়া আমাদের যেগুলো তীর্থক্ষেত্র আছে সেখানে কী হয়? সেখানে যারা পুণ্যপিপাসু তারা পাণ্ডাদের পায়ে টাকা দিয়ে আসে। সেখানে তো সব দেশের মানুষ মেলবার জন্যে ভিতরকার আহ্বান পায় না।

কাল একটি পত্র পেলাম। আমাদের স্কুলের পল্লী-বিভাগের যিনি অধ্যক্ষ তিনি জাহাজ থেকে আমাকে চিঠি লিখেছেন। তিনি লিখেছেন যে, জাহাজের লোকেরা তাসখেলা ও অন্যান্য এত ছোটোখাটো আমোদপ্রমোদ নিয়ে দিন কাটায় যে তিনি বিস্মিত হয়ে আমাকে লিখেছেন যে, কেমন করে তারা এর মধ্যে থাকে! যে জীবনে কোনো বড়ো প্রকাশ নেই, ক্ষুদ্র কথায় যে জীবন ভরে উঠেছে, বিশ্বের দিকে যে জীবনের কোনো প্রবাহ নেই,

তারা কেমন করে তার মধ্যে থাকে, কী করে তারা মনে তৃপ্তি পায়!

শ্রীযুক্ত এল্‌ম্‌হার্‌স্‌ট্‌ এই-যে বেদনা অনুভব করেছেন তার কারণ কী? কারণ এই যে, তিনি আশ্রমে যে কার্যের ভার নিয়েছেন তাতে করে তাঁকে বৃহতের ক্ষেত্রে এসে দাঁড়াতে হয়েছে। তিনি তাঁর কর্মকে অবলম্বন করে সমস্ত গ্রামবাসীদের কল্যাণক্ষেত্রে এসে দাঁড়িয়েছেন। এ কাজ তাঁর আপনার স্বার্থের জন্যে নয়। তিনি সমস্ত গ্রামবাসীদের মানুষ বলে শ্রদ্ধা করে সকলের সঙ্গে মেলবার সুযোগ পেয়েছিলেন বলে এ জায়গা তাঁর কাছে তীর্থ হয়ে উঠেছে। এই-যে আশেপাশের গরিব অজ্ঞ, এদের মধ্যে যাবার তিনি পথ পেয়েছিলেন। সেই-জন্যে তাঁর সঙ্গে যেসমস্ত বড়ো বড়ো ধনী ছিলেন— তাঁদের কেউ-বা জজ, কেউ-বা ম্যাজিস্ট্রেট— তাঁদের তিনি মনে মনে অত্যন্ত অকৃতার্থ বলে বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁরা এখানে প্রভূত ক্ষমতা পেলেও, সমস্ত দেশবাসীর সহিত অব্যাহত মিলনের পথটি খুঁজে পান নি। তাঁরা ভারতে কোনো তীর্থে এসে পৌঁছলেন না। তাঁদের কেউ-বা রাজতক্তায় এসে ঠেকলেন, কেউ-বা লোহার সিন্ধুকে এসে ঠেকলেন, তাঁরা পুণ্যতীর্থে এসে ঠেকলেন না। আমাদের সাহেব সুরুলে এসে এর তীর্থের রূপটি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। আমরা এখানে থেকেও যদি সেটি উপলব্ধি করতে না পারি তবে আমাদের মতো অকৃতার্থ

আর কেউ নেই। তাই বলছি, আমাদের এখানে কর্মের মধ্যে, এর জ্ঞানের সাধনার মধ্যে যেন কল্যাণকে উপলব্ধি করতে পারি! এ জায়গা শুধু পাঠশালা নয়, এই জায়গা তীর্থ। দেশবিদেশ থেকে লোকেরা এখানে এসে যেন বলতে পারে— আ বাঁচলাম, আমরা ক্ষুদ্র সংসারের বাইরে এসে বিশ্বের ও বিশ্বদেবতার দর্শন লাভ করলাম।

৫ বৈশাখ ১৩৩০

শান্তিনিকেতন

সিলভ্যাঁ লেভি রবীন্দ্রনাথের নিকট বাংলা শিখিতেছেন

৯

আমাদের অভাব বিস্তর, আমাদের নালিশের কথাও অনেক আছে। সেই অভাবের বোধ জাগাবার ও দূর করবার জন্যে, নালিশের বৃত্তান্ত বোঝাবার ও তার নিষ্পত্তি করবার জন্যে যাঁরা অকৃত্রিম উৎসাহ ও প্রাজ্ঞতার সঙ্গে চেষ্টা করছেন তাঁরা দেশের হিতকারী ; তাঁদের 'পরে আমাদের শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ণ থাক্।

কিন্তু কেবলমাত্র অপমান ও দারিদ্র্যের দ্বারা দেশের আত্মপরিচয় হয় না, তাতে আমাদের প্রচ্ছন্ন করে। যে নক্ষত্রের আলোক নিবে গেছে অন্ধকারই তার পক্ষে একমাত্র অভিশাপ নয়, নিখিল জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে তার অপ্রকাশই হচ্ছে তার সবচেয়ে বড়ো অবমাননা। অন্ধকার তাকে কেবল আপনার মধ্যেই বদ্ধ করে, আলোক তাকে সকলের সঙ্গে যোগযুক্ত করে রাখে।

ভারতের যেখানে অভাব, যেখানে অপমান, সেখানে সে বিশ্বের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন। এই অভাবই যদি তার একান্ত হত, ভারত যদি মধ্য-আফ্রিকা-খণ্ডের মতো সত্যই দৈন্যপ্রধান হত, তা হলে নিজের নিরবচ্ছিন্ন কালিমার মধ্যেই অব্যক্ত হয়ে থাকা ছাড়া তার আর গতি ছিল না।

কিন্তু কৃষ্ণপক্ষই ভারতের একমাত্র পক্ষ নয়, শুক্লপক্ষের আলোক থেকে বিধাতা তাকে বঞ্চিত করেন নি। সেই

আলোকের যোগেই সে আপন পূর্ণিমার গৌরব নিখিলের কাছে উদ্‌ঘাটিত করবার অধিকারী।

বিশ্বভারতী ভারতের সেই আলোকসম্পদের বার্তা বহন ও ঘোষণ করবার ভার নিয়েছে। যেখানে ভারতের অমাবস্যা সেখানে তার কার্পণ্য। কিন্তু একমাত্র সেই কার্পণ্যকে স্বীকার করেই কি সে বিশ্বের কাছে লজ্জিত হয়ে থাকবে। যেখানে তার পূর্ণিমা সেখানে তার দাক্ষিণ্য থাকা চাই তো। এই দাক্ষিণ্যেই তার পরিচয়, সেইখানেই নিখিল বিশ্ব তার নিমন্ত্রণ স্বীকার করে নেবেই।

যার ঘরে নিমন্ত্রণ চলে না সেই তো একঘরে, সমাজে সেই চিরলাঞ্ছিত। আমরা বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে বলতে চাই, ভারতে বিশ্বের সেই নিমন্ত্রণ বন্ধ হবার কারণ নেই। যারা অবিশ্বাসী, যারা একমাত্র তার অভাবের দিকেই সমস্ত দৃষ্টি রেখেছে, তারা বলে, যতক্ষণ না রাজ্যে স্বাতন্ত্র্য, বাণিজ্যে সমৃদ্ধি লাভ করব ততক্ষণ অবজ্ঞা করে ধনীরা আমাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করবেই না। কিন্তু এমন কথা বলায় শুধু স্বদেশের অপমান তা নয়, এতে সর্বমানবের অপমান। বুদ্ধদেব যখন অকিঞ্চনতা গ্রহণ করেই সত্যপ্রচারের ভার নিয়েছিলেন তখন তিনি এই কথাই সপ্রমাণ করেছিলেন যে, সত্য আত্মমহিমাতেই গৌরবান্বিত। সূর্য আপন আলোকেই স্বপ্রকাশ; স্যাকরার দোকানে সোনার গিল্টি না করালে তার মূল্য হবে না, ঘোরতর বেনের মুখেও এ কথা শোভা পায় না।

যে স্বদেশাভিমান আমরা পশ্চিমের কাছ থেকে ধার করে নিয়েছি তারই মধ্যে রাজ্যবাণিজ্যগত সম্পদের প্রতি একান্ত বিশ্বাসপরতার অশুচিতা রয়ে গেছে। সেইজন্যেই আজকের দিনে ভারতবাসীও এমন কথাও বলতে লজ্জা বোধ করে না যে, রাষ্ট্রীয় গৌরব সর্বাগ্রে, তার পরে সত্যের গৌরব। কোনো কোনো পাশ্চাত্য মহাদেশে দেখে এসেছি, ধনের অভিমানেই সেখানকার সমস্ত শিক্ষা দীক্ষা সাধনাকে রাহুগ্রস্ত করে রেখেছে। সেখানে বিপুল ধনের ভারাকর্ষণে মানুষের মাথা মাটির দিকে ঝুঁকে পড়েছে। পশ্চিমকে খোঁটা দিয়ে স্বজাতিদম্ভ প্রকাশ করবার বেলায় আমরা যে মুখে সর্বদাই পশ্চিমের এই বস্তুলুব্ধতার নিন্দা করে থাকি সেই মুখেই যখন সত্যসম্পদ্‌কে শক্তিসম্পদের পশ্চাদ্‌বর্তী করে রাখবার প্রস্তাব করে থাকি তখন নিশ্চয়ই আমাদের অশুভগ্রহ কুটিল হাস্য করে। যেমন কোনো কোনো শুচিতাভিমানী ব্রাহ্মণ অপাংক্তেয়ের বাড়িতে যে মুখে আহার করে আসে বাইরে এসে সেই মুখেই তার নিন্দা করে, এও ঠিক সেইমতো।

বিশ্বভারতীর কণ্ঠ দিয়ে এই কথাই আমরা বলতে চাই যে, ভারতবর্ষে সত্যসম্পদ বিনষ্ট হয় নি। না যদি হয়ে থাকে তা হলে সত্যের দায়িত্ব মানতেই হবে। ধনবানের ধন ধনীর একমাত্র নিজের হতে পারে, কিন্তু সত্যবানের সত্য বিশ্বের। সত্যলাভের সঙ্গে সঙ্গেই তার নিমন্ত্রণ-প্রচার আছেই। ঋষি যখনই বুঝলেন ‘বেদাহমেতম্‌’—

আমি একে জেনেছি, তখনই তাঁকে বলতে হল, 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ' — তোমরা অমৃতের পুত্র, তোমরা সকলে শুনে যাও।

তোমরা সকলে শুনে যাও, পিতামহদের এই নিমন্ত্রণ-বাণী যদি আজ ভারতবর্ষে নীরব হয়ে থাকে তবে সাম্রাজ্যে স্বাধীনতা, বাণিজ্যে সমৃদ্ধি, কিছুতেই আমাদের আর গৌরব দিতে পারে না। ভারতে সত্যধন যদি লুপ্ত হয়ে থাকে তবেই বিশ্বের প্রতি তার নিমন্ত্রণের অধিকারও লুপ্ত হয়ে গেছে। আজকের দিনে যারা ভারতের নিমন্ত্রণে বিশ্বাস করে না তারা ভারতের সত্যেও বিশ্বাস করে না। আমরা বিশ্বাস করি। বিশ্বভারতী সেই বিশ্বাসকে আমাদের স্বদেশবাসীর কাছে প্রকাশ করুক ও সর্বদেশবাসীর কাছে প্রচার করুক। বিশ্বভারতীতে ভারতের নিমন্ত্রণবাণী বিশ্বের কাছে ঘোষিত হোক। বিশ্বভারতীতে ভারত আপনার সেই সম্পদ্‌কে উপলব্ধি করুক, যে সম্পদ্‌কে সর্বজনের কাছে দান করার দ্বারাই লাভ করা যায়।

প্র. পৌষ ১৩৩০

১০

আমি যখন এই শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপন করে এখানে ছেলেদের আনলুম তখন আমার নিজের বিশেষ কিছু দেবার বা বলবার মতো ছিল না। কিন্তু আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, এখানকার এই প্রভাতের আলো, শ্যামল প্রান্তর, গাছপালা, যেন শিশুদের চিত্তকে স্পর্শ করতে পারে। কারণ প্রকৃতির সাহচর্যে তরুণ চিত্তে আনন্দসঞ্চারের দরকার আছে; বিশ্বের চারি দিককার রসাস্বাদ করা ও সকালের আলো সন্ধ্যার সূর্যাস্তের সৌন্দর্য উপভোগ করার মধ্য দিয়ে শিশুদের জীবনের উন্মেষ আপনার থেকেই হতে থাকে। আমি চেয়েছিলুম যে তারা অনুভব করুক যে, বসুন্ধরা তাদের ধাত্রীর মতো কোলে করে মানুষ করছে। তারা শহরের যে ইটকাঠপাথরের মধ্যে বর্ধিত হয় সেই জড়তার কারাগার থেকে তাদের মুক্তি দিতে হবে। এই উদ্দেশ্যে আমি আকাশ-আলোর অঙ্ক-শায়ী উদার প্রান্তরে এই শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেছিলুম। আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, শান্তিনিকেতনের গাছপালা-পাখিই এদের শিক্ষার ভার নেবে। আর সেইসঙ্গে কিছু কিছু মানুষের কাছ থেকেও এরা শিক্ষা লাভ করবে। কারণ, বিশ্বপ্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে যে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা আছে তাতে করে শিশুচিত্তের বিষম ক্ষতি হয়েছে।

এই যোগবিচ্ছেদের দ্বারা যে স্বাতন্ত্র্যের সৃষ্টি হয় তাতে করে মানুষের অকল্যাণ হয়েছে। পৃথিবীতে এই দুর্ভাগ্য অনেক দিন থেকে চলে এসেছে। তাই আমার মনে হয়েছিল যে, বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে যোগস্থাপন করবার একটি অনুকূল ক্ষেত্র তৈরি করতে হবে। এমনি করে এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়।

তখন আমার নিজের সহায় সম্বল কিছু ছিল না, কারণ আমি নিজে বরাবর ইস্কুলমাস্টারকে এড়িয়ে চলেছি। বই-পড়া বিদ্যা ছেলেদের শেখাব এমন দুঃসাহস ছিল না। কিন্তু আমাকে বাল্যকাল থেকে বিশ্বপ্রকৃতির বাণী মুগ্ধ করেছিল, আমি তার সঙ্গে একান্ত আত্মীয়তার যোগ অনুভব করেছি। বই পড়ার চেয়ে যে তার কত বেশি মূল্য, তা যে কতখানি শক্তি ও প্রেরণা দান করে, তা আমি নিজে জানি। আমি কতদিন একা মাসের পর মাস বুনো হাঁসের পাড়ায় জীবন যাপন করেছি। এই বালুচরদের সঙ্গে জীবনযাপনকালে প্রকৃতির যা-কিছু দান তা আমি যতই অঞ্জলি ভরে গ্রহণ করেছি ততই আমি পেয়েছি, আমার চিত্ত ভরপুর হয়ে গেছে। তাই শিশুরা যে এখানে আনন্দে দৌড়চ্ছে, গাছে চড়ছে, কলহাস্যে আকাশ মুখর করে তুলছে— আমার মনে হয়েছে যে, এরা এমন-কিছু লাভ করেছে যা দুর্লভ। তাদের বিদ্যার কী মার্কা মারা হল এটাই সবচেয়ে বড়ো কথা নয়; কিন্তু তাদের চিত্তের পেয়ালা বিশ্বের অমৃতরসে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে, আনন্দে

উপচে উঠেছে, এই ব্যাপারটি বহুমূল্য। এই হাসি-গান-আনন্দে গল্পে ভিতরে ভিতরে তাদের মনের পরিপুষ্টি হয়েছে। অভিভাবকেরা হয়তো তা বুঝবেন না, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষকেরা হয়তো তার জন্য পাশের নম্বর দিতে রাজি হবেন না, কিন্তু আমি জানি এ অতি আদরণীয়। প্রকৃতির কোলে থেকে সরস্বতীকে মাতৃরূপে লাভ করা, এ পরম সৌভাগ্যের কথা। এমনি করে আমার বিদ্যালয়ের সূত্রপাত হল।

তার পর একটি দ্বার খুলে যাওয়াতে ভিতরের কপাট-গুলি উদ্‌ঘাটিত হতে লাগল। আসলে খোলবার জিনিস একটি, কিন্তু পাবার জিনিস বহু। কিন্তু প্রথম দ্বারটি বন্ধ থাকলে ভিতরে প্রবেশ করবার উপায় থাকে না। প্রকৃতির আশ্রয় থেকে বঞ্চিত হবার মধ্যে যে কৃত্রিম শিক্ষা সেটাই হল গোড়াকার সেই বন্ধনদশা যা ছিন্ন না করলে রসভাণ্ডারে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য। তাই মানুষের মুক্তির উপায় হচ্ছে, প্রকৃতিকে ধাত্রী বলে স্বীকার করে নিয়ে তাঁরই আশ্রয়ে শিক্ষকতা লাভ করা। এই মুক্তির আদর্শ নিয়েই এই শিক্ষাকেন্দ্রের পত্তন হল।

এখানকার এই মুক্ত বায়ুতে আমরা যে মুক্তি পেয়ে গেলুম আজ তা গর্ব করে বলবার আছে। এতে করে আমাদের যে কত বন্ধনদশা ঘুচল, কত যে সংকীর্ণ সংস্কার দূর হল তা বলে শেষ করা যায় না। এখানে আমরা সব মানুষকে আপনার বলে স্বীকার করতে শিখেছি, এখানে

মানুষের পরস্পরের সম্বন্ধ ক্রমশ সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে।

এটি যে পরম সৌভাগ্যের কথা তা আমাদের জানতে হবে। কারণ এ কথা আগেই বলেছি যে, মানুষের মধ্যে একটি মস্ত পীড়া হচ্ছে, তার লোকালয়ে একান্তভাবে অবরোধ। বিশ্বপ্রকৃতির থেকে বিচ্ছেদ তার চিত্তশক্তিকে খর্ব করে দিচ্ছে। কিন্তু তার চেয়েও মানুষের মধ্যে আর-একটি অস্বাভাবিকতা আছে— তা হচ্ছে এই যে, মানুষই মানুষের পরম শত্রু। এটি খুব সাংঘাতিক কথা। এর মধ্যে যে তার কতখানি চিত্তসংকোচ আছে তা আমরা অভ্যাসবশত জানতে পারি না। স্বাজাত্যের দম্ভে আমরা কোণঠেসা হয়ে গেছি, বিশ্বের বিস্তীর্ণ অধিকারে আপনাদের বঞ্চিত করেছি। এই ভীষণ বাধাকে অপসারিত করতে হবে; আমাদের জানতে হবে যে, যেখানে মানুষের চিত্ত-সম্পদ আছে সেখানে দেশবিদেশের ভেদ নেই, ভৌগোলিক ভাগবিভাগ নেই। পর্বত অরণ্য মরু, এরা মানুষের আত্মাকে কারারুদ্ধ করতে পারে না।

বাংলার যে মাটির ফসলে ধান হচ্ছে, যে মাটিতে গাছ বেড়ে উঠছে, সেই উপরিতলের মাটি হল বাংলাদেশের; কিন্তু এ কথা জানতে হবে যে, নিচেকার ভূমি পৃথিবীর সর্বত্র পরিব্যাপ্ত আছে, সুতরাং এ জায়গায় সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে তার গভীরতম নাড়ির যোগ। এই তার ধাত্রীভূমিটি যদি সার্বভৌমিক না হত তবে এমন করে বাংলার শ্যামলতা

দেখা দিত না। মাটি তুলে নিয়ে টবের ছোটো জায়গাতেও তো গাছ লাগানো যায়, কিন্তু তাতে করে যথেষ্ট ফললাভ হয় না। বড়ো জায়গার যে মাটি তাতেই যথার্থ ফসল উৎপন্ন হয়। ঠিক তেমনি অন্তরের ক্ষেত্রে আমরা যেখানে বিশ্বকে অস্বীকার করছি, বলছি যে তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও বড়ো হওয়া যায়, সেখানেই আমরা মস্ত ভুল করছি।

পৃথিবীতে যেখানে সভ্যতার নানা ধারা এসে মিলিত হয়েছে সেখানেই জ্ঞানের তীর্থভূমি বিরচিত হয়েছে। সেখানে নানা দিক থেকে নানা জাতির সমাবেশ হওয়াতে একটি মহামিলন ঘটেছে। গ্রীস রোম প্রভৃতি বড়ো সভ্যতার মধ্যে নানা জ্ঞানধারার সম্মিলন ছিল, তাই তা একঘরে হয়ে ইতিহাসে প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকে নি। ভারতবর্ষের সভ্যতাতেও তেমনি আর্য দ্রাবিড় পারসিক প্রভৃতি নানা বিচিত্র জাতির মিলন হয়েছিল। আমাদের এই সমন্বয়কে মানতে হবে। পৃথিবীর ইতিহাসে যারা বর্বর তারাই সবচেয়ে স্বতন্ত্র; তারা নূতন লোকদের স্বদেশে প্রবেশ করতে দেয় নি, বর্ণ ভাষা প্রভৃতির বৈষম্য যখনই দেখেছে তখনই তা দোষের বলে বিষবাণ প্রয়োগ করে মারতে গিয়েছে।

আজকার দিনে বিশ্বমানবকে আপনার বলে স্বীকার করবার সময় এসেছে। আমাদের অন্তরের অপরিমেয় প্রেম ও জ্ঞানের দ্বারা এই কথা জানতে হবে যে, মানুষ শুধু

কোনো বিশেষ জাতির অন্তর্গত নয় ; মানুষের সবচেয়ে বড়ো পরিচয় হচ্ছে— সে মানুষ। আজকার দিনে এই কথা বলবার সময় এসেছে যে, মানুষ সর্বদেশের সর্বকালের। তার মধ্যে কোনো জাতীয়তা বা বর্ণভেদ নেই। সেই পরিচয়সাধন হয় নি ব'লেই মানুষ আজ অপরের বিত্ত আহরণ করে বড়ো হতে চায়। সে আপনাকে মারছে, অন্যকে মারতে তার হাত কম্পিত হচ্ছে না— সে এতবড়ো অপকর্ম করতে সাহস পাচ্ছে।

ভারতবর্ষ তার জাতরক্ষা করবার স্বপক্ষে কি পাশ্চাত্য দেশের নজির টেনে আনবে। আমরা কি এ কথা ভুলে গেছি যে, য়ুরোপ ও আমেরিকা আপন আপন ন্যাশনালিজ্‌মের ভিত্তিপত্তন করে যে বিরাট প্রাচীর নির্মাণ করেছে আমাদের দেশে তেমন ভিত্তিপত্তন কখনও হয় নি। ভারতবর্ষ এই কথা বলেছিল যে, যিনি বিশ্বকে আপনার বলে উপলব্ধি করতে পেরেছেন তিনিই যথার্থ সত্যকে লাভ করেছেন। তিনি অপ্রকাশ থাকেন না; 'ন ততো বিজুগুপ্সতে', তিনি সর্বলোকে সর্বকালে প্রকাশিত হন। কিন্তু যারা অপ্রকাশ, যারা অন্যকে স্বীকার করল না, তারা কখনও বড়ো হতে পারল না, ইতিহাসে তারা কোনো বড়ো সত্যকে রেখে যেতে পারল না। তাই কার্থেজ ইতিহাসে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কার্থেজ বিশ্বের সমস্ত ধনরত্ন দোহন করতে চেয়েছিল। সুতরাং সে এমন-কিছু সম্পদ রেখে যায় নি যার দ্বারা ভবিষ্যৎ যুগের মানুষের পাথেয়

রচনা হয়। তাই ভেনিসও কোনো বাণী রেখে যেতে পারল না। সে কেবলই বেনের মতো নিয়েছে, জমিয়েছে, কিছুই দিয়ে যেতে পারল না। কিন্তু মানুষ যখনই বিশ্বে আপনার জ্ঞানের ও প্রেমের অধিকার বিস্তৃত করতে পেরেছে তখনই সে আপন সত্যকে লাভ করেছে, বড়ো হয়েছে।

প্রথমে আমি শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপন ক'রে এই উদ্দেশ্যে ছেলেদের এখানে এনেছিলুম যে, বিশ্বপ্রকৃতির উদার ক্ষেত্রে আমি এদের মুক্তি দেব। কিন্তু ক্রমশ আমার মনে হল যে, মানুষে মানুষে যে ভীষণ ব্যবধান আছে তাকে অপসারিত ক'রে মানুষকে সর্বমানবের বিরাট লোকে মুক্তি দিতে হবে। আমার বিদ্যালয়ের পরিণতির ইতিহাসের সঙ্গে সেই আন্তরিক আকাঙ্ক্ষাটি অভিব্যক্ত হয়েছিল। কারণ বিশ্বভারতী নামে যে প্রতিষ্ঠান তা এই আহ্বান নিয়ে স্থাপিত হয়েছিল যে, মানুষকে শুধু প্রকৃতির ক্ষেত্রে নয়, কিন্তু মানুষের মধ্যে মুক্তি দিতে হবে। নিজের ঘরের— নিজের দেশের মধ্যে যে মুক্তি তা হল ছোটো কথা; তাতে করে সত্য খণ্ডিত হয়, আর সেজন্যই জগতে অশান্তির সৃষ্টি হয়। ইতিহাসে বারে বারে পদে পদে এই সত্যের বিচ্যুতি হয়েছে ব'লে মানুষ পীড়িত হয়েছে, বিদ্রোহানল জ্বালিয়েছে। মানুষে মানুষে যে সত্য— 'আত্মবৎ সর্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পশ্যতি', এই কথার মধ্যে যে বিশ্বজনীন সত্য আছে তা মানুষ মানে নি, স্বদেশের গণ্ডিতে আপনাদের আবদ্ধ

করেছে। মানুষ যে পরিমাণে এই ঐক্যকে স্বীকার করেছে সে পরিমাণে সে যথার্থ সত্যকে পেয়েছে, আপনার পূর্ণ-পরিচয় লাভ করেছে।

এ কথা আজকার দিনে যদি আমরা না উপলব্ধি করি তবে কি তার দণ্ড নেই। মানুষের এই বড়ো সত্যের অপলাপ হলে যে বিষম ক্ষতি, তা কি আমাদের জানতে হবে না। মানুষ মানুষকে পীড়া দেয় এত বড়ো অন্যায় আচরণ আমাদের নিবারণ করতে হবে, বিশ্বভারতীতে আমরা সেই সত্য স্বীকার করব বলে এসেছি। অন্যেরা যে কাজেরই ভার নিন-না— বণিক বাণিজ্যবিস্তার করুন, ধনী ধনসঞ্চয় করুন, কিন্তু এখানে সর্বমানবের যোগসাধনের সেতু রচিত হবে। অতিথিশালার দ্বার খুলবে, যার চৌমাথায় দাঁড়িয়ে আমরা সকলকে আহ্বান করতে কুণ্ঠিত হব না। এই মিলনক্ষেত্রে আমাদের ভারতীয় সম্পদ্‌কে ভুললে চলবে না, সেই ঐশ্বর্যের প্রতি একান্ত আস্থা স্থাপন করে তাকে শ্রদ্ধায় গ্রহণ করতে হবে। বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীতে সে প্রাসাদসৌধ নির্মাণ করেছিলেন আজ তো তার কোনো চিহ্ন নেই ; ঐতিহাসিকেরা তাঁর গোষ্ঠীগোত্রের আজ পর্যন্ত মীমাংসা করতে পারল না। কিন্তু কালিদাস যে কাব্য রচনা করে গেছেন তার মধ্যে কোনো স্থানবিচার নেই ; তা তো শুধু ভারতীয় নয়, তা যে চিরন্তন সর্বদেশের সর্বকালের সম্পদ হয়ে রইল। যখন সবাই বলবে যে, এটা আমার, আমি পেলুম, তখনই তা যথার্থ দেওয়া হল।

এই-যে দেবার অধিকার লাভ করা, এর জন্য উৎসাহ চাই, সাধনার উদ্যম চাই। আমাদের কৃপণতা করলে চলবে না। কোনো বড়ো সম্পদ্‌কে গ্রহণ ও প্রচার করতে হলে বিপুল আনন্দে সমস্ত আঘাত অপমান সহ্য করে অকাতরে সব ত্যাগ করতে হবে। পৃথিবীর দেয়ালি-উৎসবে ভারতের যে প্রদীপ জ্বলবে সেই প্রদীপশিখার যেন অস্বীকৃতি না ঘটে, বিদ্রূপের দ্বারা যেন তাকে আচ্ছন্ন না করি। আত্ম-প্রকাশের পথ অবারিত হোক, ত্যাগের দ্বারা আনন্দিত হও।

আজকার উৎসবের দিনে আমাদের এই প্রার্থনা যে, সকল অন্ধকার ও অসত্য থেকে আমাদের জ্যোতিতে নিয়ে যাও— সোনা-হীরা-মাণিক্যের জ্যোতি নয়, কিন্তু অধ্যাত্ম-লোকের জ্যোতিতে নিয়ে যাও। ভারতবর্ষ আজ এই প্রার্থনা জানাচ্ছে যে, তাকে মৃত্যু থেকে অমৃতলোকে নিয়ে যাও। আমরা অকিঞ্চন হলেও তবু আমাদের কণ্ঠ থেকে সকল মানুষের জন্য এই প্রার্থনা ধ্বনিত হোক। আনন্দস্বরূপ, তোমার প্রকাশ পূর্ণ হোক। রুদ্র, তোমার রুদ্রতার মধ্যে অনেক দুঃখদারিদ্র্য আছে— আমরা যেন বলতে পারি যে, সেই ঘন মেঘের আবরণ ভেদ করেও তোমার দক্ষিণ মুখ দেখেছি। 'বেদাহম্‌'— জেনেছি। 'আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ'— অন্ধকারেরই ওপার থেকে দেখেছি জ্যোতির রূপ। তাই অন্ধকারকে আর ভয় করি নে। যে অন্ধকার নিজেদের ছোটো গণ্ডির মধ্যেই

আমাদের ছোটো পরিচয়ে আবদ্ধ করে তাকে স্বীকার করি নে। যে আলো সকলের কাছে আমাদের প্রকাশ করে এবং সকলকে আমাদের কাছে প্রকাশ করে আমরা তারই অভিনন্দন করি।

৭ পৌষ ১৩৩০

শান্তিনিকেতন

১১

আজ আমার আর একবার আশ্রম থেকে দূরে যাবার সময় উপস্থিত হয়েছে, হয়তো কিছু দীর্ঘকালের জন্যে এবার বিদেশে আমাকে কাটাতে হবে। যাবার পূর্বে আর একবার এই আশ্রম সম্বন্ধে, এই কর্ম সম্বন্ধে আমাদের যা কথা আছে তা সুস্পষ্ট করে বলে যেতে চাই।

আজ আমার চোখের সামনে আমাদের আশ্রমের এই বর্তমান ছবি— এই ছাত্রনিবাস, কলাভবন, গ্রন্থাগার, অতিথিশালা, সব স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে! ভাবছি, কী করে এর আরম্ভ, এর পরিণাম কোথায়। সকলের চেয়ে এইটেই আশ্চর্য যে, যে লোক একেবারে অযোগ্য— মনে করবেন না এ কোনোরকম কৃত্রিম বিনয়ের কথা— তাকে দিয়ে এই কাজ সাধন করে নেবার বিধান। ছাত্রদের যেদিন এখানে আহ্বান করলুম সেদিন আমার হাতে কেবল যে অর্থ ছিল না তা নয়, একটা বড়ো ঋণভারে তখন আমি একান্ত বিপন্ন। তা শোধ করবার কোনো উপায় আমার ছিল না। তার পরে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া সম্বন্ধে আমার যে কত অক্ষমতা ছিল তা সকলেই জানেন। আমি ভালো করে পড়ি নি, আমাদের দেশে যে শিক্ষা-প্রণালী প্রচলিত ছিল তার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না। সব রকমের অযোগ্যতা এবং দৈন্য নিয়ে কাজে নেমেছিলুম।

এর আরম্ভ অতি ক্ষীণ এবং দুর্বল ছিল, গুটি-পাঁচেক ছাত্র ছিল। ছাত্রদের কাছ থেকে বেতন নিতুম না; ছেলেদের অন্নবস্ত্র, প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী যেমন করে হোক আমাকেই জোগাতে হত, অধ্যাপকদের সাংসারিক অভাব মোচন করতে হত। বৎসরের পর বৎসর যায়, অর্থাভাব সমানই রইল, বিদ্যালয় বাড়তে লাগল। দেখা গেল, বেতন না নিলে বিদ্যালয় রক্ষা করা যায় না। বেতনের প্রবর্তন হল; কিন্তু অভাব দূর হল না। আমার গ্রন্থের স্বত্ব কিছু কিছু করে বিক্রয় করতে হল। এদিকে ওদিকে দু-একটা যা সম্পত্তি ছিল তা গেল, অলংকার বিক্রয় করলুম— নিজের সংসারকে রিক্ত করে কাজ চালাতে হল। কী দুঃসাহসে তখন প্রবৃত্ত হয়েছিলুম জানি নে। স্বপ্নের ঘোরে যে মানুষ দুর্গম পথে ঘুরে বেড়িয়েছে সে যেমন জেগে উঠে কেঁপে ওঠে, আজ পিছন দিকে যখন তাকিয়ে দেখি তখন আমারও সেই রকমের হৃৎকম্প হয়।

অথচ এটি সামান্যই একটি বিদ্যালয় ছিল। কিন্তু এই সামান্য ব্যাপারটি নিয়েই আবাল্যকালের সাহিত্যসাধনাও আমাকে অনেক পরিমাণে বর্জন করতে হল। এর কারণ কী, এত আকর্ষণ কিসের। এই প্রশ্নের যে উত্তর আমার মনে আসছে সেটা আপনাদের কাছে বলি। অতি গভীরভাবে নিবিড়ভাবে এই বিশ্বপ্রকৃতিকে শিশুকাল থেকে আমি ভালোবেসেছি। আমি খুব প্রবলভাবেই অনুভব করেছি যে, শহরের জীবনযাত্রা আমাদের চার দিকে যন্ত্রের প্রাচীর

তুলে দিয়ে বিশ্বের সঙ্গে আমাদের বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিয়েছে। এখানকার আশ্রমে, প্রকৃতির প্রাণনিকেতনের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে, বসন্ত-শরতের পুষ্পোৎসবে ছেলেদের যে স্থান করে দিয়েছি তারই আনন্দে দুঃসাধ্য ত্যাগের মধ্যে আমাকে ধরে রেখেছিল। প্রকৃতিমাতা যে অমৃত পরিবেশন করেন সেই অমৃত গানের সঙ্গে মিলিয়ে নানা আনন্দ-অনুষ্ঠানের মধ্যে ফলিয়ে এদের সকলকে বিতরণ করেছি। এরই সফলতা প্রতিদিন আমাকে উৎসাহ দিয়েছে। আর যে একটি কথা অনেক দিন থেকে আমার মনে জেগে ছিল সে হচ্ছে এই যে, ছাত্র ও শিক্ষকের সম্বন্ধ অত্যন্ত সত্য হওয়া দরকার। মানুষের পরস্পরের মধ্যে সকল প্রকার ব্যাপারেই দেনাপাওনার সম্বন্ধ। কখনও বেতন দিয়ে, কখনও ত্যাগের বিনিময়ে, কখনও-বা জবরদস্তির দ্বারা মানুষ এই দেওয়া-নেওয়ার প্রবাহকে দিনরাত চালিয়ে রাখছে। বিদ্যা যে দেবে এবং বিদ্যা যে নেবে তাদের উভয়ের মাঝখানে যে সেতু সেই সেতুটি হচ্ছে ভক্তিস্নেহের সম্বন্ধ। সেই আত্মীয়তার সম্বন্ধ না থেকে যদি কেবল শুষ্ক কর্তব্য বা ব্যবসায়ের সম্বন্ধই থাকে তা হলে যারা পায় তারা হতভাগ্য, যারা দেয় তারাও হতভাগ্য। সাংসারিক অভাবমোচনের জন্য বাহিরের দিক থেকে শিক্ষককে বেতন নিতে হয়, কিন্তু তাঁর অন্তরের সম্বন্ধ সত্য হওয়া চাই। এ আদর্শ আমাদের বিদ্যালয়ে সেদিন অনেক দূর পর্যন্ত চালাতে পেরেছিলুম। তখন শিক্ষকেরা ছাত্রদের

সঙ্গে একসঙ্গে বেড়িয়েছেন, খেলা করেছেন, তাদের সঙ্গে তাঁদের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ ছিল। ভাষা কি ইতিহাস কি ভূগোল নূতন উৎকৃষ্ট প্রণালীতে কী শিখিয়েছি না-শিখিয়েছি জানি নে, কিন্তু যে জিনিসটাকে কোনো বিদ্যালয়ে কেউ অত্যাবশ্যক বলে মনে করে না, অথচ যা সবচেয়ে বড়ো জিনিস, আমাদের বিদ্যালয়ে তার স্থান হয়েছে মনে করে আনন্দে অন্য সকল অভাব ভুলে ছিলুম।

ক্রমে আমাদের সেই অতি ছোটো বিদ্যালয় বড়ো হয়েছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ থেকে আপনারা অনেকে সমাগত হয়েছেন, ছাত্ররাও বিভিন্ন প্রদেশ থেকে এসেছে। ক্রমে এর সীমা আরও দূরে প্রসারিত হল, বিদেশ থেকে বন্ধুরা এসে এই কাজে যোগ দিলেন। যা প্রচ্ছন্ন ছিল তা কোনোদিন যে এমন ব্যাপকভাবে প্রকাশমান হবে তা কখনও ভাবি নি।

আমরা চেষ্টা করি নি, আমরা প্রত্যাশা করি নি। চিরদিন অল্প আয়োজন এবং অল্প শক্তিতেই আমরা একান্তে কাজ করেছি। তবু আমাদের এই প্রতিষ্ঠান যেন নিজেরই অন্তর্‌গূঢ় স্বভাব অনুসরণ করে বিশ্বের ক্ষেত্রে নিজেকে ব্যক্ত করেছে। পাশ্চাত্য দেশের যেসব মনীষী এখানে এসেছিলেন— লেভি, উইণ্টার্‌নিট্‌জ্‌, লেস্‌নি, তাঁরা যে এমন কিছু এখানে পেয়েছিলেন যা বাংলাদেশের কোণের মধ্যে বদ্ধ নয়, তা থেকে বুঝতে পারি এখানে কোনো একটি সত্যের প্রকাশ হয়েছে। তাঁরা যে আনন্দ যে

শ্রদ্ধা যে উৎসাহ অনুভব করে গেছেন তা যে এখানে আমাদের সকলের মধ্যে স্ফূর্তি পাচ্ছে তা নয়— তৎসত্ত্বেও এখানকার বাতাসের মধ্যে এমন কোনো একটা সার্থকতা আছে যার স্পর্শে দূরাগত অতিথিরা অন্তরঙ্গ সুহৃদ হয়ে উঠেছেন— যাঁরা কিছুদিনের জন্যে এসেছিলেন তাঁদের সঙ্গে চিরকালের যোগ ঘটেছে।

আজ ভেদবুদ্ধি ও বিদ্বেষবুদ্ধি সমস্ত পৃথিবীতে আগুন লাগিয়েছে, মানুষে মানুষে এমন জগদ্‌ব্যাপী পরমশক্রতার সংঘাত প্রাচীন ইতিহাসে নেই। দেশে দেশান্তরে এই আগুন ছড়িয়ে গেল। প্রাচ্য মহাদেশে আমরা বহু শতাব্দী ঘুমিয়ে ছিলুম, আমরা যে জাগলুম সে এরই আঘাতে। জাপান মার খেয়ে জেগেছে। ভারতবর্ষ থেকে প্রেমের দৌত্য একদিন তাকে জাগিয়েছিল, আজ লোভ এসে ঘা দিয়ে ভয়ে তাকে জাগিয়েছে। লোভের দন্তের ঘা খেয়ে যে জাগে সে অন্যকেও ভয় দেখায়। জাপান কোরিয়াকে মারলে, চীনকে মারতে গিয়েছিল।

মানুষের আজ কী অসহ্য বেদনা। দাসত্বে ব্রতী হয়ে কত কলে সে ক্লিষ্ট হচ্ছে— মানুষের পূর্ণতা সর্বত্র পীড়িত। মনুষ্যত্বের এই-যে খর্বতা, সমস্ত পৃথিবী জুড়ে যন্ত্রদেবতার এই-যে পূজা, এই-যে আত্মহত্যা, পৃথিবীর কোথাও একে নিরস্ত করবার প্রয়াস কি থাকবে না। আমরা দরিদ্র, অন্য জাতির অধীন, তাই বলেই কি মানুষ তার সত্য সম্পদ আমাদের কাছ থেকে নেবে না। যদি সাধনা সত্য

হয়, অন্তরে আমাদের বাণী থাকে, তবে মাথা হেঁট করে সকলকে নিতেই হবে।

একদিন বুদ্ধ বললেন, 'আমি সমস্ত মানুষের দুঃখ দূর করব।' দুঃখ তিনি সত্যই দূর করতে পেরেছিলেন কি না সেটি বড়ো কথা নয়; বড়ো কথা হচ্ছে, তিনি এটি ইচ্ছা করেছিলেন, সমস্ত জীবের জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। ভারতবর্ষ ধনী হোক, প্রবল হোক, এ তাঁর তপস্যা ছিল না; সমস্ত মানুষের জন্য তিনি সাধনা করেছিলেন। আজ ভারতের মাটিতে আবার সেই সাধনা জেগে উঠুক সেই ইচ্ছাকে ভারতবর্ষ থেকে কি দূর করে দেওয়া চলে। আমি যে বিশ্বভারতীকে এই ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত করতে পারি নি সে আমার নিজেরই দৈন্য— আমি যদি সাধক হতুম, সে একাগ্রতার শক্তি যদি আমার থাকত, তবে সব আপনিই হত। আজ অত্যন্ত নম্রভাবে সানুনয়ে আপনাদের জানাচ্ছি, আমি অযোগ্য, তাই এ কাজ আমার একলার নয়, এ সাধনা আপনাদের সকলের। এ আপনাদের গ্রহণ করতে হবে।

বিদেশে যখন যাই তখন সর্বমানুষের সম্বন্ধে আমাদের দেশে চৈতন্যের যে ক্ষীণতা আছে তা ভুলে যাই, ভারতের যজ্ঞক্ষেত্রে সকলকে আহ্বান করি। ফিরে এসে দেখি— এখানে সে বৃহৎ ভূমিকা কোথায়, বৃহৎ জগতের মাঝখানে যে আমরা আছি সে দৃষ্টি কোথায়! আমার শক্তি নেই, কিন্তু মনে ভরসা ছিল— বিশ্বের মর্মস্থান থেকে যে ডাক

এসেছে তা অনেকেই শুনতে পাবে, অনেকে একত্র মিলিত হবে। সেই বোধের বাধা আমাদের আশ্রম থেকে যেন সর্বপ্রযত্নে দূর করি, রিপুর প্রভাব-জনিত যে দুঃখ তা থেকে যেন বাঁচি। হয়তো আমাদের সাধনা সিদ্ধ হবে, হয়তো হবে না। আমি গীতার কথা অন্তরের সঙ্গে মানি —ফলে লোভ করলে আপনাকে ভোলাব, অন্যকে ভোলাব। আমাদের কাজ বাইরে থেকে খুবই সামান্য— ক'টিই বা আমাদের ছাত্র, ক'টিই বা বিভাগ, কিন্তু অন্তরের দিক থেকে এর অধিকারের সীমা নেই। আমাদের সকলের সম্মিলিত চিত্ত সেই অধিকারকে দৃঢ় করুক, সেই অধিকারকে অবলম্বন করে বিচিত্র কল্যাণের সৃষ্টি করুক— সেই সৃষ্টির আনন্দ এবং তপোদুঃখ আমাদের হোক। ছোটো ছোটো মতের অনৈক্য, স্বার্থের সংঘাত ভুলে গিয়ে সাধনাকে আমরা বিশুদ্ধ রাখব সেই উৎসাহ আমাদের আসুক। আমার নিজের চিত্তের তেজ যদি বিশুদ্ধ ও উজ্জ্বল থাকত তা হলে আমি গুরুর আসন থেকে এই দাবি করতুম। কিন্তু আমি আপনাদের সঙ্গে এক পথেরই পথিক মাত্র; আমি চালনা করতে পারি নে, চাই নে। আপনারা জানেন, আমার যা দেবার তা দিয়েছি, কৃপণতা করি নি। তাই আপনাদের কাছ থেকে ভিক্ষা করবার অধিকার আমার আজ হয়েছে।

১৭ ভাদ্র ১৩৩১

শান্তিনিকেতন

১২

একদিন আমাদের এখানে যে উদ্যোগ আরম্ভ হয়েছিল সে অনেক দিনের কথা। আমাদের একটি পূর্বতন ছাত্র সেদিনকার ইতিহাসের একটি খণ্ডকালকে কয়েকটি চিঠিপত্র ও মুদ্রিত বিবরণীর ভিতর দিয়ে আমার সামনে এনে দিয়েছিল। সেই ছাত্রটি এই বিদ্যায়তনের প্রতিষ্ঠা থেকেই এর সঙ্গে যুক্ত ছিল। কাল রাত্রে সেদিন-কার ইতিকথার ছিন্নলিপি যখন পড়ে দেখছিলুম তখন মনে পড়ল, কী ক্ষীণ আরম্ভ, কত তুচ্ছ আয়োজন। সেদিন যে মূর্তি এই আশ্রমের শালবীথিচ্ছায়ায় দেখা দিয়েছিল, আজকের দিনের বিশ্বভারতীর রূপ তার মধ্যে এতই প্রচ্ছন্ন ছিল যে, সে কারও কল্পনাতেও আসতে পারত না। এই অনুষ্ঠানের প্রথম সূচনা-দিনে আমরা আমাদের পুরাতন আচার্যদের আহ্বানমন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেম— যে মন্ত্রে তাঁরা সকলকে ডেকে বলেছিলেন 'আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা'; বলেছিলেন 'জলধারাসকল যেমন সমুদ্রের মধ্যে এসে মিলিত হয়, তেমনি করে সকলে এখানে মিলিত হোক।' তাঁদেরই আহ্বান আমাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হল, কিন্তু ক্ষীণকণ্ঠে। সেদিন সেই বেদমন্ত্র-আবৃত্তির ভিতরে আমাদের আশা ছিল, ইচ্ছা ছিল। কিন্তু আজ যে প্রাণের বিকাশ আমরা অনুভব করছি, সুস্পষ্টভাবে সেটা

আমাদের গোচর ছিল না। এই বিদ্যালয়ের প্রচ্ছন্ন অন্তঃস্তর থেকে সত্যের বীজ আমার জীবিতকালের মধ্যেই অঙ্কুরিত হয়ে বিশ্বভারতী রূপে বিস্তার লাভ করবে, ভরসা করে এই কল্পনাকে সেদিন মনে স্থান দিতে পারি নি। কোনো একদিন বিরাট ভারতবর্ষ এই আশ্রমের মধ্যে আসন পাতবে, এই ভারতবর্ষ— যেখানে নানা জাতি নানা বিদ্যা নানা সম্প্রদায়ের সমাবেশ— সেই ভারতবর্ষের সকলের জন্যই এখানে স্থান প্রশস্ত হবে, সকলেই এখানে আতিথ্যের অধিকার পাবে, এখানে পরস্পরের সম্মিলনের মধ্যে কোনো বাধা কোনো আঘাত থাকবে না, এই সংকল্প আমার মনে ছিল। তখন একান্ত মনে এই ইচ্ছা করেছিলেম যে, ভারতবর্ষের আর সর্বত্রই আমরা বন্ধনের রূপ দেখতে পাই, কিন্তু এখানে আমরা মুক্তির রূপকেই যেন স্পষ্ট দেখি। যে বন্ধন ভারতবর্ষকে জর্জরিত করেছে সে তো বাইরে নয়, সে আমাদেরই ভিতরে। যাতেই বিচ্ছিন্ন করে তাই যে বন্ধন। যে কারারুদ্ধ সে বিচ্ছিন্ন বলেই বন্দী। ভেদবিভেদের প্রকাণ্ড শৃঙ্খলের অসংখ্য চক্র সমস্ত ভারতবর্ষকে ছিন্নবিচ্ছিন্নতায় পীড়িত ক্লিষ্ট করে রেখেছে, আত্মীয়তার মধ্যে মানুষের যে মুক্তি সেই মুক্তিকে প্রত্যেক পদে বাধা দিচ্ছে, পরস্পরবিভিন্নতাই ক্রমে পরস্পরবিরোধিতার দিকে আমাদের আকর্ষণ করে নিয়ে যাচ্ছে। এক প্রদেশের সঙ্গে অন্য প্রদেশের অনৈক্যকে আমরা রাষ্ট্রনৈতিক বক্তৃতামঞ্চে বাক্যকুহেলিকার মধ্যে ঢাকা

দিয়ে রাখতে চাই, কিন্তু জীবনের ক্ষেত্রে পরস্পরসম্বন্ধে ঈর্ষা অবজ্ঞা আত্মপরভেদবুদ্ধি কেবলই যখন কণ্টকিত হয়ে ওঠে তখন সেটার সম্বন্ধে আমাদের লজ্জাবোধ পর্যন্ত থাকে না। এমনি করে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতার আশা দূরে থাক্, পরস্পরের মধ্যে পরিচয়ের পথও সুগভীর ঔদাসীন্যের দ্বারা বাধাগ্রস্ত।

যে অন্ধকারে ভারতবর্ষে আমরা পরস্পরকে ভালো করে দেখতে পাই নে, সেইটেই আমাদের সকলের চেয়ে দুর্বলতার কারণ। রাতের বেলায় আমাদের ভয়ের প্রবৃত্তি প্রবল হয়ে ওঠে, অথচ সকালের আলোতে সেটা দূর হয়ে যায়। তার প্রধান কারণ, সকালে আমরা সকলকে দেখতে পাই, রাত্রে আমরা নিজেকে স্বতন্ত্র করে দেখি। ভারতবর্ষে সেই রাত্রি চিরন্তন হয়ে রয়েছে। মুসলমান বলতে কী বোঝায় তা সম্পূর্ণ ক'রে, আপনার ক'রে, অর্থাৎ রাম-মোহন রায় যেমন ক'রে জানতেন, তা খুব অল্প হিন্দুই জানেন। হিন্দু বলতে কী বোঝায় তাও বড়ো ক'রে, আপনার ক'রে, অর্থাৎ দারাশিকো একদিন যেমন ক'রে বুঝেছিলেন, তাও অল্প মুসলমানই জানেন। অথচ এইরকম গভীর ভাবে জানার ভিতরেই পরস্পরের ভেদ ঘোচে।

কিছুকাল থেকে আমরা কাগজে পড়ে আসছি, পঞ্জাবে অকালি শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি প্রবল ধর্ম-আন্দোলন জেগে উঠেছে, যার প্রবর্তনায় তারা দলে দলে নির্ভয়ে বধ-বন্ধনকে স্বীকার করেছে। কিন্তু অন্য শিখদের সঙ্গে তাদের

পার্থক্য কোথায়, কোন্‌খানে তারা এত প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছে, ও কোন্ সত্যের প্রতি শ্রদ্ধাবশত তারা সেই আঘাতের সঙ্গে প্রাণান্তকর সংগ্রাম করে জয়ী হয়েছে, সে সম্বন্ধে আমাদের দরদের কথা দূরে যাক্— আমাদের জিজ্ঞাসাবৃত্তি পর্যন্ত জাগে নি। অথচ কেবলমাত্র কথার জোরে এদের নিয়ে রাষ্ট্রীয় ঐক্যতন্ত্র সৃষ্টি করব বলে কল্পনা করতে কোথাও আমাদের বাধে না। দাক্ষিণাত্যে যখন মোপ্‌লা-দৌরাত্ম্য নিষ্ঠুর হয়ে দেখা দিল তখন সে সম্বন্ধে বাংলাদেশে আমরা সে পরিমাণেও বিচলিত হই নি যতটা হলে তাদের ধর্ম সমাজ ও আর্থিক কারণ-ঘটিত তথ্য জানবার জন্য আমাদের জ্ঞানগত উত্তেজনা জন্মাতে পারে। অথচ এই মালাবারের হিন্দু ও মোপ্‌লাদের নিয়ে মহাজাতিক ঐক্য স্থাপন করা সম্বন্ধে অন্তত বাক্যগত সংকল্প আমরা সর্বদাই প্রকাশ করে থাকি।

আমাদের শাস্ত্রে বলে, অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞানের বন্ধনই বন্ধন। এ কথা সকল দিকেই খাটে। যাকে জানি নে তার সম্বন্ধেই আমরা যথার্থ বিচ্ছিন্ন। কোনো বিশেষ দিনে তাকে গলা জড়িয়ে আলিঙ্গন করতে পারি, কেননা সেটা বাহ্য; তাকে বন্ধু সম্ভাষণ ক'রে অশ্রুপাত করতে পারি, কেননা সেটাও বাহ্য; কিন্তু 'উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে রাজদ্বারে শ্মশানে চ' আমরা সহজ প্রীতির অনিবার্য আকর্ষণে তাদের সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করতে পারি নে। কারণ, যাদের আমরা নিবিড়ভাবে জানি

তারাই আমাদের জ্ঞাতি। ভারতবর্ষের লোক পরস্পরের সম্বন্ধে যখন মহাজ্ঞাতি হবে তখনই তারা মহাজাতি হতে পারবে।

সেই জানবার সোপান তৈরি করার দ্বারা মেলবার শিখরে পৌঁছবার সাধনা আমরা গ্রহণ করেছি। একদা যেদিন সুহৃদ্‌বর বিধুশেখর শাস্ত্রী ভারতের সর্ব সম্প্রদায়ের বিদ্যাগুলিকে ভারতের বিদ্যাক্ষেত্রে একত্র করবার জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন তখন আমি অত্যন্ত আনন্দ ও উৎসাহ বোধ করেছিলেম। তার কারণ, শাস্ত্রীমশায় প্রাচীন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের শিক্ষাধারার পথেই বিদ্যালাভ করেছিলেন। হিন্দুদের সনাতন শাস্ত্রীয় বিদ্যার বাহিরে যেসকল বিদ্যা আছে তাকেও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করতে পারলে তবেই যে আমাদের শিক্ষা উদারভাবে সার্থক হতে পারে, তাঁর মুখে এ কথার সত্য বিশেষভাবে বল পেয়ে আমার কাছে প্রকাশ পেয়েছিল। আমি অনুভব করেছিলেম, এই ঔদার্য, বিদ্যার ক্ষেত্রে সকল জাতির প্রতি এই সসম্মান আতিথ্য, এইটিই হচ্ছে যথার্থ ভারতীয়। সেই কারণেই ভারতবর্ষ পুরাকালে যখন গ্রীক-রোমকদের কাছ থেকে জ্যোতির্বিদ্যার বিশেষ পন্থা গ্রহণ করেছিলেন, তখন ম্লেচ্ছগুরুদের ঋষিকল্প বলে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হন নি। আজ যদি এ সম্বন্ধে আমাদের কিছুমাত্র কৃপণতা ঘটে থাকে, তবে জানতে হবে আমাদের মধ্যে সেই বিশুদ্ধ ভারতীয় ভাবের বিকৃতি ঘটেছে।

এ দেশের নানা জাতির পরিচয়ের উপর ভারতের যে আত্মপরিচয় নির্ভর করে, এখানে কোনো-এক জায়গায় তার তো সাধনা থাকা দরকার। শান্তিনিকেতনে সেই সাধনার প্রতিষ্ঠা ধ্রুব হোক, এই ভাবনাটি এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আমাদের লক্ষ্যে ও অলক্ষ্যে বিরাজ করছে। কিন্তু আমার সাধ্য কী। সাধ্য থাকলেও এ যদি আমার একলারই সৃষ্টি হয় তা হলে এর সার্থকতা কী। যে দীপ পথিকের প্রত্যাশায় বাতায়নে অপেক্ষা করে থাকে সেই দীপটুকু জ্বেলে রেখে দিয়ে আমি বিদায় নেব, এইটুকুমাত্রই আমার ভরসা ছিল।

তার পরে অসংখ্য অভাব দৈন্য বিরোধ ও ব্যাঘাতের ভিতর দিয়ে দুর্গম পথে এ'কে বহন করে এসেছি। এর অন্তর্নিহিত সত্য ক্রমে আপনার আবরণ মোচন করতে করতে আজ আমাদের সামনে অনেকটা পরিমাণে সুস্পষ্ট রূপ ধারণ করেছে। আমাদের আনন্দের দিন এল। আজ আপনারা এই-যে সমবেত হয়েছেন, এ আমাদের কত বড়ো সৌভাগ্য। এর সদস্য, যাঁরা নানা কর্মে ব্যাপৃত, এর সঙ্গে তাঁদের যোগ ক্রমে ক্রমে যে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে, এ আমাদের কত বড়ো সৌভাগ্য।

এই কর্মানুষ্ঠানটিকে বহুকাল একলা বহন করার পর যেদিন সকলের হাতে সমর্পণ করলুম সেদিন মনে এই দ্বিধা এসেছিল যে, সকলে একে শ্রদ্ধা করে গ্রহণ করবেন কি না। অন্তরায় অনেক ছিল, এখনও আছে। তবুও সংশয় ও

সংকোচ থাকা সত্ত্বেও এ'কে সম্পূর্ণভাবেই সকলের কাছে নিবেদন করে দিয়েছি। কেউ যেন না মনে করেন এটা একজন লোকের কীর্তি এবং তিনি এটাকে নিজের সঙ্গেই একান্ত করে জড়িয়ে রেখেছেন। যাকে এত দীর্ঘকাল এত করে পালন করে এসেছি, তাকে যদি সাধারণের কাছে শ্রদ্ধেয় করে থাকি, সে আমার সবচেয়ে বড়ো সৌভাগ্য। সেদিন আজ এসেছে বলি নে, কিন্তু সেদিনের সূচনাও কি হয় নি? যেমন সেই প্রথম দিনে আজকের দিনের সম্ভাবনা কল্পনা করতে সাহস পাই নি, অথচ এই ভবিষ্যৎকে গোপনে সে বহন করেছিল, তেমনি ভারতবর্ষের দূর ইতিহাসে এই বিশ্বভারতীর যে পূর্ণ অভিব্যক্তি হবে তা প্রত্যয় করব না কেন। সেই প্রত্যয়ের দ্বারাই এর প্রকাশ বল পেয়ে ধ্রুব হয়ে ওঠে, এ কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। এর প্রমাণ আরম্ভ হয়েছে যখন দেখতে পাচ্ছি আপনারা এর ভার গ্রহণ করেছেন। এই প্রতিষ্ঠানের দিক থেকে এটা বড়ো কথা, আবার আমার দিক থেকেও এ তো কম কথা নয়। কোনো একজন মানুষের পক্ষে এর ভার দুঃসহ। এই ভারকে বহন করবার অনুকূলে আমার আন্তরিক প্রত্যয় ও প্রত্যাশার আনন্দ যদিও আমাকে বল দিয়েছে, তবু আমার শক্তির দৈন্য কোনোদিনই ভুলতে অবকাশ পাই নি। কত অভাব কত অসামর্থ্যের দ্বারা এত কাল প্রত্যহ পীড়িত হয়ে এসেছি, বাইরের অকারণ প্রতিকূলতা একে কত দিক থেকে ক্ষুণ্ণ করেছে। তবু এর সমস্ত ত্রুটি

অসম্পূর্ণতা, এর সমস্ত দারিদ্র্য সত্ত্বেও আপনারা এ'কে শ্রদ্ধা করে পালন করবার ভার নিয়েছেন, এতে আমাকে যে কত দয়া করেছেন তা আমিই জানি। সেজন্য ব্যক্তিগতভাবে আজ আপনাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি।

এই প্রতিষ্ঠানের বাহ্যায়তনটিকে সুচিন্তিত বিধি-বিধান দ্বারা সুসম্বদ্ধ করবার ভার আপনারা নিয়েছেন। এই নিয়মসংঘটনের কাজ আমি যে সম্পূর্ণ বুঝি তা বলতে পারি নে, শরীরের দুর্বলতা-বশত সব সময়ে এতে আমি যথেষ্ট মন দিতেও অক্ষম হয়েছি। কিন্তু নিশ্চিত জানি, এই অঙ্গবন্ধনের প্রয়োজন আছে। জলের পক্ষে জলাশয়ের উপযোগিতা কে অস্বীকার করবে। সেইসঙ্গে এ কথাও মনে রাখা চাই যে, চিত্ত দেহে বাস করে বটে কিন্তু দেহকে অতিক্রম করে। দেহ বিশেষ সীমায় বদ্ধ, কিন্তু চিত্তের বিচরণক্ষেত্র সমস্ত বিশ্বে। দেহব্যবস্থা অতিজটিলতার দ্বারা চিত্তব্যাপ্তির বাধা যাতে না ঘটায়, এ কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। এই প্রতিষ্ঠানের কায়ারূপটির পরিচয় সম্প্রতি আমার কাছে সুস্পষ্ট ও সম্পূর্ণ নয়, কিন্তু এর চিত্ত-রূপটির প্রসার আমি বিশেষ করেই দেখেছি। তার কারণ, আমি আশ্রমের বাইরে দূরে দূরে বারবার ভ্রমণ করে থাকি। কতবার মনে হয়েছে, যাঁরা এই বিশ্বভারতীর যজ্ঞকর্তা তাঁরা যদি আমার সঙ্গে এসে বাইরের জগতে এর পরিচয় পেতেন তা হলে জানতে পারতেন কোন্

বৃহৎ ভূমির উপরে এর আশ্রয়। তা হলে বিশেষ দেশকাল ও বিধিবিধানের অতীত এর মুক্তরূপটি দেখতে পেতেন। বিদেশের লোকের কাছে ভারতের সেই প্রকাশ সেই পরিচয়ের প্রতি প্রভূত শ্রদ্ধা দেখেছি যা ভারতের ভূ-সীমানার মধ্যে বদ্ধ হয়ে থাকতে পারে না, যা আলোর মতো দীপকে ছাড়িয়ে যায়। এর থেকে এই বুঝেছি, ভারতের এমন কিছু সম্পদ আছে যার প্রতি দাবি সমস্ত বিশ্বের। জাত্যভিমানের প্রবল উগ্রতা মন থেকে নিরস্ত করে নম্রভাবে সেই দাবি পূরণ করবার দায়িত্ব আমাদের। যে ভারত সকল কালের সকল লোকের, সেই ভারতে সকল কাল ও সকল লোককে নিমন্ত্রণ করবার ভার বিশ্বভারতীর।

কিছুদিন হল যখন দক্ষিণ-আমেরিকায় গিয়ে রুগ্নকক্ষে বদ্ধ ছিলাম, তখন প্রায় প্রত্যহ আগন্তুকের দল প্রশ্ন নিয়ে আমার কাছে এসেছিলেন। তাঁদের সকল প্রশ্নের ভিতরকার কথাটা এই যে, পৃথিবীকে দেবার মতো কোন্ ঐশ্বর্য ভারতবর্ষের আছে। ভারতের ঐশ্বর্য বলতে এই বুঝি, যা-কিছু তার নিজের লোকের বিশেষ ব্যবহারে নিঃশেষ করবার নয়। যা নিয়ে ভারত দানের অধিকার, আতিথ্যের অধিকার পায়— যার জোরে সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে সে নিজের আসন গ্রহণ করতে পারে— অর্থাৎ যাতে তার অভাবের পরিচয় নয়, তার পূর্ণতারই পরিচয়— তাই তার সম্পদ। প্রত্যেক বড়ো জাতির নিজের বৈষয়িক ব্যাপার একটা আছে, সেটাতে বিশেষভাবে তার আপন প্রয়োজন

সিদ্ধ হয়। তার সৈন্যসামন্ত-অর্থসামর্থ্যে আর কারও ভাগ চলে না। সেখানে দানের দ্বারা তার ক্ষতি হয়। ইতিহাসে ফিনিসীয় প্রভৃতি এমনসকল ধনী জাতির কথা শোনা যায় যারা অর্থ-অর্জনেই নিরন্তর নিযুক্ত ছিল। তারা কিছুই দিয়ে যায় নি, রেখে যায় নি। তাদের অর্থ যতই থাক্, তাদের ঐশ্বর্য ছিল না। ইতিহাসের জীর্ণ পাতার মধ্যে তারা আছে, মানুষের চিত্তের মধ্যে নেই। ইজিপ্ট্ গ্রীস রোম প্যালেস্টাইন চীন প্রভৃতি দেশ শুধু নিজের ভোজ্য নয় সমস্ত পৃথিবীর ভোগ্য সামগ্রী উৎপন্ন করেছে। বিশ্বের তৃপ্তিতে তারা গৌরবান্বিত। সেই কারণে সমস্ত পৃথিবীর প্রশ্ন এই— ভারতবর্ষ শুধু নিজেকে নয়, পৃথিবীকে কী দিয়েছে। আমি আমার সাধ্যমত কিছু বলবার চেষ্টা করেছি এবং দেখেছি, তাতে তাদের আকাঙ্ক্ষা বেড়ে গেছে। তাই আমার মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে যে, আজ ভারতবর্ষের কেবল যে ভিক্ষার ঝুলিই সম্বল তা নয়, তার প্রাঙ্গণে এমন একটি বিশ্বযজ্ঞের স্থান আছে যেখানে অক্ষয় আত্মদানের জন্য সকলকে সে আহ্বান করতে পারে।

সকলের জন্য ভারতের যে বাণী তাকেই আমরা বলি বিশ্বভারতী। সেই বাণীর প্রকাশ আমাদের বিদ্যালয়টুকুর মধ্যে নয়। শিব আসেন দরিদ্র ভিক্ষুকের মূর্তি ধরে, কিন্তু একদিন প্রকাশ হয়ে পড়ে সকল ঐশ্বর্য তাঁর মধ্যে। বিশ্বভারতী এই আশ্রমে দীন ছদ্মবেশে এসেছিল ছোটো বিদ্যালয়-রূপে। সেই তার লীলার আরম্ভ, কিন্তু সেখানেই

তার চরম সত্য নয়। সেখানে সে ছিল ভিক্ষুক, মুক্তিভিক্ষা আহরণ করছিল। আজ সে দানের ভাণ্ডার খুলতে উদ্যত। সেই ভাণ্ডার ভারতের। বিশ্বপৃথিবী আজ অঙ্গনে দাঁড়িয়ে বলছে, 'আমি এসেছি।' তাকে যদি বলি, 'আমাদের নিজের দায়ে ব্যস্ত আছি, তোমাকে দেবার কথা ভাবতে পারি নে'— তার মতো লজ্জা কিছুই নেই। কেননা দিতে না পারলেই হারাতে হয়।

এ কথা অস্বীকার করবার জো নেই যে, বর্তমান যুগে সমস্ত পৃথিবীর উপরে য়ুরোপ আপন প্রভাব বিস্তার করেছে। তার কারণ আকস্মিক নয়, বাহ্যিক নয়। তার কারণ, যে বর্বরতা আপন প্রয়োজনটুকুর উপরেই সমস্ত মন দেয়, সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করে, য়ুরোপ তাকে অনেক দূরে ছাড়িয়ে গেছে। সে এমন কোনো সত্যের নাগাল পেয়েছে যা সর্বকালীন, সর্বজনীন, যা তার সমস্ত প্রয়োজনকে পরিপূর্ণ করে অক্ষয়ভাবে উদ্‌বৃত্ত থাকে। এই হচ্ছে তার বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানকে প্রকাশের দ্বারাই পৃথিবীতে সে আপনার অধিকার পেয়েছে। যদি কোনো কারণে য়ুরোপের দৈহিক বিনাশও ঘটে, তবু এই সত্যের মূল্যে মানুষের ইতিহাসে তার স্থান কোনোদিন বিলুপ্ত হতে পারবে না। মানুষকে চিরদিনের মতো সে সম্পদ্‌শালী করে দিয়েছে, এই তার সকলের চেয়ে বড়ো গৌরব, এই তার অমরতা। অথচ এই য়ুরোপ যেখানে আপনার লোভকে সমস্ত মানুষের কল্যাণের চেয়ে বড়ো করেছে, সেখানেই তার অভাব প্রকাশ

পায়, সেখানেই তার খর্বতা, তার বর্বরতা। তার একমাত্র কারণ এই যে, বিচ্ছিন্নভাবে কেবল আপনটুকুর মধ্যে মানুষের সত্য নেই— পশুধর্মেই সেই বিচ্ছিন্নতা, বিনাশশীল দৈহিক প্রাণ ছাড়া যে পশুর আর কোনো প্রাণ নেই। যাঁরা মহাপুরুষ তাঁরা আপনার জীবনে সেই অনির্বাণ আলোককেই জ্বালেন, যার দ্বারা মানুষ নিজেকে সকলের মধ্যে উপলব্ধি করতে পারে।

পশ্চিম-মহাদেশ তার পলিটিক্সের দ্বারা বৃহৎ পৃথিবীকে পর করে দিয়েছে, তার বিজ্ঞানের দ্বারা বৃহৎ পৃথিবীকে নিমন্ত্রণ করেছে। বৃহৎকালের মধ্যে ইতিহাসের উদার রূপ যদি আমরা দেখতে পাই তা হলে দেখব, আত্মম্ভরি পলিটিক্সের দিকে য়ুরোপের আত্মাবমাননা, সেখানে তার অন্ধকার; বিজ্ঞানের দিকেই তার আলোক জ্বলেছে, সেখানেই তার যথার্থ আত্মপ্রকাশ; কেননা বিজ্ঞান সত্য, আর সত্যই অমরতা দান করে। বর্তমান যুগে বিজ্ঞানেই য়ুরোপকে সার্থকতা দিয়েছে, কেননা বিজ্ঞান বিশ্বকে প্রকাশ করে; আর তার সর্বভুক্ ক্ষুধিত পলিটিক্স্ তার বিনাশকেই সৃষ্টি করছে, কেননা পলিটিক্সের শোণিতরক্ত-উত্তেজনায় সে নিজেকে ছাড়া আর সমস্তকেই অস্পষ্ট ও ছোটো করে দেখে; সুতরাং সত্যকে খণ্ডিত করার দ্বারা অশান্তির চক্রবাত্যায় আত্মহত্যাকে আবর্তিত করে তোলে।

আমরা অত্যন্ত ভুল করব যদি মনে করি, সীমাবিহীন অহমিকা -দ্বারা, জাত্যভিমানে আবিল ভেদবুদ্ধি -দ্বারাই

য়ুরোপ বড়ো হয়েছে। এমন অসম্ভব কথা আর হতে পারে না। বস্তুত সত্যের জোরেই তার জয়যাত্রা, রিপুর আকর্ষণেই তার অধঃপতন— যে রিপুর প্রবর্তনায় আমরা আপনাকে সব দিতে চাই, বাহিরকে বঞ্চিত করি।

এখন নিজের প্রতি আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো প্রশ্ন এই যে, আমাদের কি দেবার জিনিস কিছু নেই। আমরা কি আকিঞ্চন্যের সেই চরম বর্বরতায় এসে ঠেকেছি যার কেবল অভাবই আছে, ঐশ্বর্য নেই। বিশ্বসংসার আমাদের দ্বারে এসে অভুক্ত হয়ে ফিরলে কি আমাদের কোনো কল্যাণ হতে পারে। দুর্ভিক্ষের অন্ন আমাদের উৎপাদন করতে হবে না, এমন কথা আমি কখনোই বলি নে, কিন্তু ভাণ্ডারে যদি আমাদের অমৃত থাকে তার দায়িত্ব সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে আমরা বাঁচতে পারব?

এই প্রশ্নের উত্তর যিনিই যেমন দিন-না, আমাদের মনে যে উত্তর এসেছে বিশ্বভারতীর কাজের ভিতর তারই পূর্ণ অভিব্যক্তি হতে থাক্, এই আমাদের সাধনা। বিশ্বভারতী এই বেদমন্ত্রের দ্বারাই আপন পরিচয় দিতে চায়— 'যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্'। যে আত্মীয়তা বিশ্বে বিস্তৃত হবার যোগ্য সেই আত্মীয়তার আসন এখানে আমরা পাতব। সেই আসনে জীর্ণতা নেই, মলিনতা নেই, সংকীর্ণতা নেই।

এই আসনে আমরা সবাইকে বসাতে চেয়েছি; সে কাজ কি এখনই আরম্ভ হয় নি। অন্য দেশ থেকে যেসকল

মনীষী এখানে এসে পৌঁচেছেন, আমরা নিশ্চয় জানি তাঁরা হৃদয়ের ভিতরে আহ্বান অনুভব করেছেন। আমার সুহৃদ্‌বর্গ, যাঁরা এই আশ্রমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত, তাঁরা সকলেই জানেন, আমাদের দূরদেশের অতিথিরা এখানে ভারতবর্ষেরই আতিথ্য পেয়েছেন— পেয়ে গভীর তৃপ্তিলাভ করেছেন। এখান থেকে আমরা যে কিছু পরিবেশন করছি তার প্রমাণ সেই অতিথিদের কাছেই। তাঁরা আমাদের অভিনন্দন করেছেন। আমাদের দেশের পক্ষ থেকে তাঁরা আত্মীয়তা পেয়েছেন, তাঁদের পক্ষ থেকেও আত্মীয়তার সম্বন্ধ সত্য হয়েছে।

আমি তাই বলছি, কাজ আরম্ভ হয়েছে। বিশ্বভারতীর যে সত্য তা ক্রমশ উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছে। এখানে আমরা ছাত্রদের কোন্ বিষয় পড়াচ্ছি, পড়ানো সকলের মনের মতো হচ্ছে কি না, সাধারণ কলেজের আদর্শে উচ্চশিক্ষা-বিভাগ খোলা হয়েছে বা জ্ঞানানুসন্ধান বিভাগে কিছু কাজ হচ্ছে, এ সমস্তকেই যেন আমরা আমাদের ধ্রুব পরিচয়ের জিনিস বলে না মনে করি। এসমস্ত আজ আছে, কাল না থাকতেও পারে। আশঙ্কা হয় পাছে যা ছোটো তাই বড়ো হয়ে ওঠে, পাছে একদিন আগাছাই ধানের খেতকে চাপা দেয়। বনস্পতির শাখায় কোনো বিশেষ পাখি বাসা বাঁধতে পারে, কিন্তু সেই বিশেষ পাখির বাসাই বনস্পতির একান্ত বিশেষণ নয়। নিজের মধ্যে বনস্পতি সমস্ত অরণ্য-প্রকৃতির যে সত্যপরিচয় দেয় সেইটেই তার বড়ো লক্ষণ।

পূর্বেই বলেছি, ভারতের যে প্রকাশ বিশ্বের শ্রদ্ধেয় সেই প্রকাশের দ্বারা বিশ্বকে অভ্যর্থনা করব, এই হচ্ছে আমাদের সাধনা। বিশ্বভারতীর এই কাজে পশ্চিম-মহাদেশে আমি কী অভিজ্ঞতা লাভ করেছি সে কথা বলতে আমি কুণ্ঠিত হই। দেশের লোকে অনেকে হয়তো সেটা শ্রদ্ধাপূর্বক গ্রহণ করবেন না, এমন-কি পরিহাসরসিকেরা বিদ্রূপও করতে পারেন। কিন্তু সেটাও কঠিন কথা নয়। আসলে ভাবনার কথাটা হচ্ছে এই যে, বিদেশে আমাদের দেশ যে শ্রদ্ধা লাভ করে, পাছে সেটাকে কেবলমাত্র অহংকারের সামগ্রী করে তোলা হয়। সেটা আনন্দের বিষয়, সেটা অহংকারের বিষয় নয়। যখন অহংকার করি তখন বাইরের লোকদের আরও বাইরে ফেলি, যখন আনন্দ করি তখনই তাদের নিকটের ব'লে জানি। বারম্বার এটা দেখেছি, বিদেশের যে-সব মহদাশয় লোক আমাদের ভালোবেসেছেন, আমাদের অনেকে তাঁদের বিষয়সম্পত্তির মতো গণ্য করেছেন। তাঁরা আমাদের জাতিকে যে আদর করতে পেরেছেন সেটুকু আমরা ষোলো-আনা গ্রহণ করেছি, কিন্তু আমাদের তরফে তার দায়িত্ব স্বীকার করি নি। তাঁদের ব্যবহারে তাঁদের জাতির যে গৌরব প্রকাশ হয় সেটা স্বীকার করতে অক্ষম হয়ে আমরা নিজের গভীর দৈন্যের প্রমাণ দিয়েছি। তাঁদের প্রশংসাবাক্যে আমরা নিজেদের মহৎ বলে স্পর্ধিত হয়ে উঠি; এই শিক্ষাটুকু একেবারেই ভুলে যাই যে, পরের মধ্যে যেখানে শ্রেষ্ঠতা আছে সেটাকে অকুণ্ঠিত আনন্দে স্বীকার

করা ও প্রকাশ করার মধ্যে মহত্ত্ব আছে। আমাকে এইটেতেই সকলের চেয়ে নম্র করেছে যে, ভারতের যে পরিচয় অন্য দেশে আমি বহন করে নিয়ে গেছি কোথাও তা অবমানিত হয় নি। আমাকে যাঁরা সম্মান করেছেন তাঁরা আমাকে উপলক্ষ করে ভারতবর্ষকেই শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। যখন আমি পৃথিবীতে না থাকব তখনও যেন তার ক্ষয় না ঘটে, কেননা এ সম্মান ব্যক্তিগতভাবে আমার সঙ্গে যুক্ত নয়। বিশ্বভারতীকে গ্রহণ করে ভারতের অমৃতরূপকে প্রকাশের ভার আপনারা গ্রহণ করেছেন। আপনাদের চেষ্টা সার্থক হোক, অতিথিশালা দিনে দিনে পূর্ণ হয়ে উঠুক, অভ্যাগতরা সম্মান পান, আনন্দ পান, হৃদয় দান করুন, হৃদয় গ্রহণ করুন, সত্যের ও প্রীতির আদানপ্রদানের দ্বারা পৃথিবীর সঙ্গে ভারতের যোগ গভীর ও দূরপ্রসারিত হোক এই আমার কামনা।

৯ পৌষ ১৩৩২

শান্তিনিকেতন

১৩

বাংলাদেশের পল্লীগ্রামে যখন ছিলাম, সেখানে এক সন্ন্যাসিনী আমাকে শ্রদ্ধা করতেন। তিনি কুটিরনির্মাণের জন্য আমার কাছে ভূমি ভিক্ষা নিয়েছিলেন— সেই ভূমি থেকে যে ফসল উৎপন্ন হত তাই দিয়ে তাঁর আহার চলত, এবং দুই-চারিটি অনাথ শিশুদের পালন করতেন। তাঁর মাতা ছিলেন সংসারে— তাঁর মাতার অবস্থাও ছিল সচ্ছল —কন্যাকে ঘরে ফিরিয়ে নেবার জন্যে তিনি অনেক চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু কন্যা সম্মত হন নি। তিনি আমাকে বলেছিলেন, নিজের ঘরের অন্নে আত্মাভিমান জন্মে— মন থেকে এই ভ্রম কিছুতে ঘুচতে চায় না যে, এই অন্নের মালেক আমিই, আমাকে আমিই খাওয়াচ্ছি। কিন্তু দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ক'রে যে অন্ন পাই সে অন্ন ভগবানের— তিনি সকল মানুষের হাত দিয়ে সেই অন্ন আমাকে দেন, তার উপরে আমার নিজের দাবি নেই, তাঁর দয়ার উপর ভরসা।

বাংলাদেশকে বাংলা ভাষার ভিতর চিরজীবন আমি সেবা করেছি, আমার পঁয়ষট্টি বৎসর বয়সের মধ্যে অন্তত পঞ্চান্ন বৎসর আমি সাহিত্যের সাধনা করে সরস্বতীর কাছ থেকে যা-কিছু বর লাভ করেছি সমস্তই বাংলাদেশের ভাণ্ডারে জমা করে দিয়েছি। এইজন্য বাংলাদেশের কাছ থেকে আমি যতটুক স্নেহ ও সম্মান লাভ করেছি তার

উপরে আমার নিজের দাবি আছে— বাংলাদেশ যদি কৃপণতা করে, যদি আমাকে আমার প্রাপ্য না দেয়, তা হলে অভিমান করে আমি বলতে পারি যে, আমার কাছে বাংলাদেশ ঋণী রয়ে গেল।

কিন্তু বাংলার বাইরে বা বিদেশে যে সমাদর, যে প্রীতি লাভ করি, তার উপরে আমার আত্মাভিমানের দাবি নেই। এইজন্য এই দানকেই ভগবানের দান বলে আমি গ্রহণ করি। তিনি আমাকে দয়া করেন, নতুবা অপরেরা আমাকে দয়া করেন এমন কোনো হেতু নেই।

ভগবানের এই দানে মন নম্র হয়, এতে অহংকার জন্মে না। আমরা নিজের পকেটের চার-আনার পয়সা নিয়েও গর্ব করতে পারি, কিন্তু ভগবান আকাশ ভরে যে সোনার আলো ঢেলে দিয়েছেন, কোনো কালেই যার মূল্য শোধ করতে পারব না, সেই আলোর অধিকার নিয়ে কেবল আনন্দই করতে পারি, কিন্তু গর্ব করতে পারি নে। পরের দত্ত সমাদরও সেইরকম অমূল্য— সেই দান আমি নম্রশিরেই গ্রহণ করি, উদ্ধতশিরে নয়। এই সমাদরে আমি বাংলা দেশের সন্তান ব'লে উপলব্ধি করবার সুযোগ লাভ করি নি। বাংলাদেশের ছোটো ঘরে আমার গর্ব করবার স্থান ছিল, কিন্তু ভারতের বড়ো ঘরে আমার আনন্দ করবার স্থান।

আমার প্রভু আমাকে তাঁর দেউড়িতে কেবলমাত্র বাঁশি বাজাবার ভার দেন নি, শুধু কবিতার মালা গাঁথিয়ে তিনি আমাকে ছুটি দিলেন না। আমার যৌবন যখন

পার হয়ে গেল, আমার চুল যখন পাকল, তখন তাঁর অঙ্গনে আমার তলব পড়ল। সেখানে তিনি শিশুদের মা হয়ে বসে আছেন। তিনি আমাকে হেসে বললেন, 'ওরে পুত্র, এতদিন তুই তো কোনো কাজেই লাগলি নে, কেবল কথাই গেঁথে বেড়ালি। বয়স গেল, এখন যে কয়টা দিন বাকি আছে, এই শিশুদের সেবা কর্।'

কাজ শুরু করে দিলুম— সেই আমার শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের কাজ। কয়েক জন বাঙালির ছেলেকে নিয়ে মাস্টারি শুরু করে দিলুম। মনে অহংকার হল, এ আমার কাজ, এ আমার সৃষ্টি। মনে হল, আমি বাংলাদেশের হিতসাধন করছি, এ আমারই শক্তি।

কিন্তু এ যে প্রভুরই আদেশ, যে প্রভু কেবল বাংলা-দেশের নন, সেই কথা যাঁর কাজ তিনিই স্মরণ করিয়ে দিলেন। সমুদ্রপার হতে এলেন বন্ধু এণ্ড্রুজ, এলেন বন্ধু পিয়ার্সন। আপন লোকের বন্ধুত্বের উপর দাবি আছে, সে বন্ধুত্ব আপন লোকেরই সেবায় লাগে। কিন্তু যাঁদের সঙ্গে নাড়ীর সম্বন্ধ নেই, যাঁদের ভাষা স্বতন্ত্র, ব্যবহার স্বতন্ত্র, তাঁরা যখন অনাহূত আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন, তখনই আমার অহংকার ঘুচে গেল, আমার আনন্দ জন্মাল। যখন ভগবান পরকে আপন করে দেন, তখন সেই আত্মীয়তার মধ্যে তাঁকেই আত্মীয় বলে জানতে পারি।

আমার মনে গর্ব জন্মেছিল যে, আমি স্বদেশের জন্য অনেক করছি— আমার অর্থ, আমার সামর্থ্য আমি

স্বদেশকে উৎসর্গ করছি। আমার সেই গর্ব চূর্ণ হয়ে গেল যখন বিদেশী এলেন এই কাজে। তখনই বুঝলুম— এও আমার কাজ নয়, এ তাঁরই কাজ যিনি সকল মানুষের ভগবান। এই-যে বিদেশী বন্ধুদের অযাচিত পাঠিয়ে দিলেন, এঁরা আত্মীয়স্বজনদের হতে বহু দূরে পৃথিবীর প্রান্তে ভারতের প্রান্তে এক খ্যাতিহীন প্রান্তরের মাঝখানে নিজেদের সমস্ত জীবন ঢেলে দিলেন ; একদিনের জন্যও ভাবলেন না, যাদের জন্য তাঁদের আত্মোৎসর্গ তারা বিদেশী, তারা পূর্বদেশী, তারা শিশু, তাঁদের ঋণ শোধ করবার মতো অর্থ তাদের নেই, শক্তি তাদের নেই, মান তাদের নেই। তাঁরা নিজে পরম পণ্ডিত, কত সম্মানের পদ তাঁদের জন্য পথ চেয়ে আছে, কত ঊর্ধ্ববেতন তাঁদের আহ্বান করছে, সমস্ত তাঁরা প্রত্যাখ্যান করেছেন— অকিঞ্চনভাবে, স্বদেশীর সম্মান ও স্নেহ হতে বঞ্চিত হয়ে, রাজপুরুষদের সন্দেহ -দ্বারা অনুধাবিত হয়ে, গ্রীষ্ম এবং রোগের তাপে তাপিত হয়ে তাঁরা কাজে প্রবৃত্ত হলেন। এ কাজের বেতন তাঁরা নিলেন না, দুঃখই নিলেন। তাঁরা আপনাকে বড়ো করলেন না— প্রভুর আদেশকে বড়ো করলেন, প্রেমকে বড়ো করলেন, কাজকে বড়ো করে তুললেন।

এই তো আমার 'পরে ভগবানের দয়া— তিনি আমার গর্বকে ছোটো করে দিতেই আমার সাধনা বড়ো করে দিলেন। এখন এই সাধনা কি ছোটো বাংলাদেশের সীমার মধ্যে আর ধরে। বাংলার বাহির থেকে ছেলেরা আসতে

লাগল। আমি তাদের ডাক দিই নি, ডাকলেও আমার ডাক এত দূরে পৌঁছত না। যিনি সমুদ্রপার থেকে নিজের কণ্ঠে তাঁর সেবকদের ডেকেছেন তিনিই স্বহস্তে তাঁর সেবাক্ষেত্রের সীমানা মিটিয়ে দিতে লাগলেন।

আজ আমাদের আশ্রমে প্রায় ত্রিশ জন গুজরাটের ছেলে এসে বসেছে। সেই ছেলেদের অভিভাবকেরা আমার আশ্রমের পরম হিতৈষী। তাঁরা আমাদের সর্বপ্রকারে যত আনুকূল্য করেছেন, এমন আনুকূল্য ভারতের আর কোথাও পাই নি। অনেক দিন আমি বাঙালির ছেলেকে এই আশ্রমে মানুষ করেছি— কিন্তু বাংলাদেশে আমার সহায় নেই। সেও আমার বিধাতার দয়া। যেখানে দাবি বেশি সেখান থেকে যা পাওয়া যায় সে তো খাজনা পাওয়া। যে খাজনা পায় সে যদি-বা রাজাও হয় তবু সে হতভাগ্য, কেননা সে তার নীচের লোকের কাছ থেকেই ভিক্ষা পায়। যে দান পায় সে উপর থেকে পায়, সে প্রেমের দান, জবরদস্তির আদায়-ওয়াশিল নয়। বাংলাদেশের বাহির থেকে আমার আশ্রম যে আনুকূল্য পেয়েছে, সেই তো আশীর্বাদ— সে পবিত্র। সেই আনুকূল্যে এই আশ্রম সমস্ত বিশ্বের সামগ্রী হয়েছে।

আজ তাই আত্মাভিমান বিসর্জন করে বাংলা-দেশাভিমান বর্জন করে বাইরে আশ্রমজননীর জন্য ভিক্ষা করতে বাহির হয়েছি। শ্রদ্ধয়া দেয়ম্। সেই শ্রদ্ধার দানের দ্বারা আশ্রমকে সকলে গ্রহণ করবেন, সকলের সামগ্রী

করবেন, তাকে বিশ্বলোকে উত্তীর্ণ করবেন। এই বিশ্বলোকেই অমৃতলোক। যা-কিছু আমাদের অভিমানের গণ্ডির, আমাদের স্বার্থের গণ্ডির মধ্যে থাকে তাই মৃত্যুর অধিকারবর্তী। যা সকল মানুষের তাই সকল কালের। সকলের ভিক্ষার মধ্য দিয়ে আমাদের আশ্রমের উপরে বিধাতার অমৃত বর্ষিত হোক— সেই অমৃত-অভিষেকে আমরা, তাঁর সেবকেরা পবিত্র হই, আমাদের অহংকার ধৌত হোক, আমাদের শক্তি প্রবল ও নির্মল হোক— এই কামনা মনে নিয়ে সকলের কাছে এসেছি। সকলের মধ্য দিয়ে বিধাতা আমাদের উপর প্রসন্ন হোন, আমাদের বাক্য মন ও চেষ্টাকে তাঁর কল্যাণসৃষ্টির মধ্যে দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করুন।

প্র. জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩

১৪

বহুকাল আগে নদীতীরের সাহিত্যচর্চা থেকে জানি নে কী আহ্বানে এই প্রান্তরে এসেছিলেম। তার পর ত্রিশ বৎসর অতীত হয়ে গেল। আয়ুর প্রতি আর অধিক দাবি আছে বলে মনে করি নে। হয়তো আগামী কালে আর কিছু বলবার অবকাশ পাব না। অন্তরের কথা আজ তাই বলবার ইচ্ছা করি।

উদ্যোগের যখন আরম্ভ হয়, কেন হয় তা বলা যায় না। বীজ থেকে গাছ কেন হয় কে জানে। দুয়ের মধ্যে কোনো সাদৃশ্য নেই। প্রাণের ভিতর যখন আহ্বান আসে তখন তার চরম অর্থ কেউ জানে না। দুঃসময়ে এখানে এসেছি, দুঃখের মধ্যে দৈন্যের মধ্যে দিয়ে মৃত্যুশোক বহন করে দীর্ঘকাল চলেছি— কেন তা ভেবে পাই নে। ভালো করে বলতে পারি নে কিসের টানে এই শূন্য প্রান্তরের মধ্যে এসেছিলেম।

মানুষ আপনাকে বিশুদ্ধভাবে আবিষ্কার করে এমন কর্মের যোগে যার সঙ্গে সাংসারিক দেনাপাওনার হিসাব নেই। নিজেকে নিজের বাইরে উৎসর্গ করে দিয়ে তবে আমরা আপনাকে পাই। বোধ করি সেই ইচ্ছেই ছিল, তাই সেদিন সহসা আমার প্রকৃতিগত চিরাভ্যস্ত রচনাকার্য থেকে অনেক পরিমাণে ছুটি নিয়েছিলুম।

সেদিন আমার সংকল্প ছিল, বালকদের এমন শিক্ষা দেব যা শুধু পুঁথির শিক্ষা নয়; প্রান্তরযুক্ত অবারিত আকাশের মধ্যে যে মুক্তির আনন্দ তারই সঙ্গে মিলিয়ে যতটা পারি তাদের মানুষ করে তুলব। শিক্ষা দেবার উপকরণ যে আমি সঞ্চয় করেছিলেম তা নয়। সাধারণ শিক্ষা আমি পাই নি, তাতে আমি অভিজ্ঞ ছিলুম না। আমার আনন্দ ছিল প্রকৃতির অন্তরলোকে, গাছপালা আকাশ আলোর সহযোগে। শিশু বয়স থেকে এই আমার সত্যপরিচয়। এই আনন্দ আমি পেয়েছিলুম ব'লে দিতেও ইচ্ছে ছিল। ইস্কুলে আমরা ছেলেদের এই আনন্দ-উৎস থেকে নির্বাসিত করেছি। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে যে শিক্ষক বহুধাশক্তিযোগাৎ রূপরসগন্ধবর্ণের প্রবাহে মানুষের জীবনকে সরস ফলবান করে তুলছেন, তার থেকে ছিন্ন করে ইস্কুলমাস্টার বেতের ডগায় বিরস শিক্ষা শিশুদের গিলিয়ে দিতে চায়। আমি স্থির করলেম, শিশুদের শিক্ষার মধ্যে প্রাণরস বহানো চাই; কেবল আমাদের স্নেহ থেকে নয়, প্রকৃতির সৌন্দর্য-ভাণ্ডার থেকে প্রাণের ঐশ্বর্য তারা লাভ করবে। এই ইচ্ছাটুকু নিয়েই অতি ক্ষুদ্র আকারে আশ্রমবিদ্যালয়ের শুরু হল, এইটুকুকে সত্য করে তুলে আমি নিজেকে সত্য করে তুলতে চেয়েছিলুম।

আনন্দের ত্যাগে স্নেহের যোগে বালকদের সেবা করে হয়তো তাদের কিছু দিতে পেরেছিলুম, কিন্তু তার চেয়ে নিজেই বেশি পেয়েছি। সেদিনও প্রতিকূলতার অন্ত

ছিল না। এইভাবে কাজ আরম্ভ করে ক্রমশ এই কাজের মধ্যে আমার মন অগ্রসর হয়েছে। সেই ক্ষীণ প্রারম্ভ আজ বহু দূর পর্যন্ত এগোল। আমার সংকল্প আজ একটা রূপ লাভ করেছে। প্রতিদিন আমাকে দুঃখের যে প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে চলতে হয়েছে তার হিসাব নেব না। বারম্বার মনে ভেবেছি, আমার সত্যসংকল্পের সাধনায় কেন সবাইকে পাব না, কেন একলা আমাকে চলতে হবে। আজ সে ক্ষোভ থেকে কিছু মুক্ত হয়েছি, তাই বলতে পারছি— এ দুর্বল চিত্তের আক্ষেপ। যার বাইরের সমারোহ নেই, উত্তেজনা নেই, জনসমাজে যার প্রতিপত্তির আশা করা যায় না, যার একমাত্র মূল্য অন্তরের বিকাশে, অন্তর্যামীর সমর্থনে, তার সম্বন্ধে এ কথা জোর করে বলা চলে না— অপর লোকে কেন এর সম্বন্ধে উদাসীন। উপলব্ধি যার, দায় শুধু তারই। অন্যে অংশগ্রহণ না করলে নালিশ চলবে না। যার উপরে ভার পড়েছে তাকেই হিসেব চুকিয়ে দিয়ে চলে যেতে হবে; অংশী যদি জোটে তো ভালো, আর না যদি জোটে তো জোর খাটবে না। সমস্তই দিয়ে ফেলবার দাবি যদি অন্তর থেকে আসে তবে বলা চলবে না— এর বদলে পেলুম কী। আদেশ কানে পৌঁছলেই তা মানতে হবে।

আমাদের কাজ সত্যকে রূপ দেওয়া। অন্তরে সত্যকে স্বীকার করলে বাহিরেও তাকে প্রকাশ করা চাই। সম্পূর্ণরূপে সংকল্পকে সার্থক করেছি এ কথা কোনো কালেই বলা চলবে না— কঠিন বাধার ভিতর দিয়ে তাকে দেহ দিয়েছি।

এ ভাবনা যেন না করি— আমি যখন যাব তখন কে একে দেখবে, এর ভবিষ্যতে কী আছে কী নেই। এইটুকু সান্ত্বনা বহন করে যেতে চাই, যতটুকু পেরেছি তা করেছি, মনে যা পেয়েছি দুর্ভর হলেও কর্মে তাকে গ্রহণ করা হল। তার পরে সংসারের লীলায় এই প্রতিষ্ঠান নানা অবস্থার মধ্য দিয়ে কী ভাবে বিকাশ পাবে তা কল্পনাও করতে পারি নে। লোভ হতে পারে, আমি যে ভাবে এর প্রবর্তন করেছি অবিকল সেই ভাবে এর পরিণতি হতে থাকবে। কিন্তু সেই অহংকৃত লোভ ত্যাগ করাই চাই। সমাজের সঙ্গে কালের সঙ্গে যোগে কোন্ রূপরূপান্তরের মধ্য দিয়ে আপন প্রাণ-বেগে ভাবী কালের পথে এই প্রতিষ্ঠানের যাত্রা, আজ কে তা নির্দিষ্ট করে দিতে পারে। এর মধ্যে আমার ব্যক্তিগত যা আছে ইতিহাস তাকে চিরদিন স্বীকার করবে এমন কখনও হতেই পারে না। এর মধ্যে যা সত্য আছে তারই জয়যাত্রা অপ্রতিহত হোক। সত্যের সেই সঞ্জীবনমন্ত্র এর মধ্যে যদি থাকে তবে বাইরের অভিব্যক্তির দিকে যে রূপ এ গ্রহণ করবে আজকের দিনের ছবির সঙ্গে তার মিল হবে না ব'লেই ধরে নিতে পারি। কিন্তু 'মা গৃধঃ'— নিজের হাতে গড়া আকারের প্রতি লোভ কোরো না। যা-কিছু ক্ষুদ্র, যা আমার অহমিকার সৃষ্টি, আজ আছে কাল নেই, তাকে যেন আমরা পরমাশ্রয় ব'লে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পাকা করে গড়বার আয়োজন না করি। প্রতি মুহূর্তের সত্য চেষ্টা সত্য কর্মের মধ্য দিয়েই আমাদের প্রতিষ্ঠান

আপন সজীব পরিচয় দেবে, সেইখানেই তার চিরন্তন জীবন। জনসুলভ স্থূল সমৃদ্ধির পরিচয় দিতে প্রয়াস ক'রে ব্যবসায়ীর মন সে না কিনুক; আন্তরিক গরিমায় তার যথার্থ শ্রী প্রকাশ পাবে। আদর্শের গভীরতা যেন নিরন্তর সার্থকতায় তাকে আত্মসৃষ্টির পথে চালিত করে। এই সার্থকতার পরিমাপ কালের উপর নির্ভর করে না, কেননা সত্যের অনন্ত পরিচয় আপন বিশুদ্ধ প্রকাশক্ষণে।

প্র. জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭

১৫

আমার মধ্য-বয়সে আমি এই শান্তিনিকেতনে বালকদের নিয়ে এক বিদ্যালয় স্থাপন করতে ইচ্ছা করি। মনে তখন আশঙ্কা ও উদ্‌বেগ ছিল, কারণ কর্মে অভিজ্ঞতা ছিল না। জীবনের অভ্যাস ও তদুপযোগী শিক্ষার অভাব, অধ্যাপনা-কর্মে নিপুণতার অভাব সত্ত্বেও আমার সংকল্প দৃঢ় হয়ে উঠল। কারণ চিন্তা করে দেখলেম যে, আমাদের দেশে এক সময়ে যে শিক্ষাদানপ্রথা বর্তমান ছিল, তার পুনঃ-প্রবর্তন বিশেষ প্রয়োজন। সেই প্রথাই যে পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এমন অন্ধ পক্ষপাত আমার মনে ছিল না, কিন্তু এই কথা আমার মনকে অধিকার করে যে, মানুষ বিশ্ব-প্রকৃতি ও মানবসংসার এই দুইয়ের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করেছে, অতএব এই দুইকে একত্র সমাবেশ করে বালকদের শিক্ষায়তন গড়লে তবেই শিক্ষার পূর্ণতা ও মানবজীবনের সমগ্রতা হয়। বিশ্বপ্রকৃতির যে আহ্বান, তার থেকে বিচ্ছিন্ন করে পুঁথিগত বিদ্যা দিয়ে জোর করে শিক্ষার আয়োজন করলে শুধু শিক্ষাবস্তুকেই জমানো হয়, যে মন তাকে গ্রহণ করবে তার অবস্থা হয় ভারবাহী জন্তুর মতো। শিক্ষার উদ্দেশ্য তাতে ব্যর্থ হয়।

আমার বাল্যকালের অভিজ্ঞতা ভুলি নি। আমার বালক-মনে প্রকৃতির প্রতি সহজ অনুরাগ ছিল, তার

থেকে নির্বাসিত করে বিদ্যালয়ের নীরস শিক্ষাবিধিতে যখন আমার মনকে যন্ত্রের মতো পেষণ করা হয় তখন কঠিন যন্ত্রণা পেয়েছি। এভাবে মনকে ক্লিষ্ট করলে, এই কঠিনতায় বালকমনকে অভ্যস্ত করলে, তা মানসিক স্বাস্থ্যের অনুকূল হতে পারে না। শিক্ষার আদর্শকেই আমরা ভুলে গেছি। শিক্ষা তো শুধু সংবাদবিতরণ নয়; মানুষ সংবাদ বহন করতে জন্মায় নি, জীবনের মূলে যে লক্ষ্য আছে তাকেই গ্রহণ করা চাই। মানবজীবনের সমগ্র আদর্শকে জ্ঞানে ও কর্মে পূর্ণ করে উপলব্ধি করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য।

আমার মনে হয়েছিল, জীবনের কী লক্ষ্য এই প্রশ্নের মীমাংসা যেন শিক্ষার মধ্যে পেতে পারি। আমাদের দেশের পুরাতন শিক্ষাপ্রণালীতে তার আভাস পাওয়া যায়। তপোবনের নিভৃত তপস্যা ও অধ্যাপনার মধ্যে যে শিক্ষাসাধনা আছে তাকে আশ্রয় করে শিক্ষক ও ছাত্র জীবনের পূর্ণতা লাভ করেছিলেন। শুধু পরা বিদ্যা নয়, শিক্ষাকল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত ছন্দ জ্যোতিষ প্রভৃতি অপরা বিদ্যার অনুশীলনেও যেমন প্রাচীন কালে গুরুশিষ্য একই সাধনক্ষেত্রে মিলিত হয়েছিলেন, তেমনি সহযোগিতার সাধনা যদি এখানে হয় তবেই শিক্ষার পূর্ণতা হবে।

বর্তমানে সেই সাধনা আমরা কতদূর গ্রহণ করতে পারি তা বলা কঠিন। আজ আমাদের চিত্তবিক্ষেপের অভাব নেই। কিন্তু এই-যে প্রাচীন কালের শিক্ষাসমবায়, এ কোনো

বিশেষ কাল ও সম্প্রদায়ের অভিমত নয়। মানবচিত্তবৃত্তির মূলে সেই এক কথা আছে— মানুষ বিচ্ছিন্ন প্রাণী নয়, সব মানুষের সঙ্গে যোগে সে যুক্ত, তাতেই তার জীবনের পূর্ণতা, মানুষের এই ধর্ম। তাই যে দেশেই, যে কালেই, মানুষ যে বিদ্যা ও কর্ম উৎপন্ন করবে সে সব-কিছুতে সর্ব-মানবের অধিকার আছে। বিদ্যায় কোনো জাতিবর্ণের ভেদ নেই। মানুষ সর্বমানবের সৃষ্ট ও উদ্ভূত সম্পদের অধিকারী, তার জীবনের মূলে এই সত্য আছে। মানুষ জন্মগ্রহণসূত্রে যে শিক্ষার মধ্যে এসেছে তা এক জাতির দান নয়। কালে কালে নিখিলমানবের কর্মশিক্ষার ধারা প্রবাহিত হয়ে একই চিত্তসমুদ্রে মিলিত হয়েছে। সেই চিত্তসাগরতীরে মানুষ জন্মলাভ করে, তারই আহ্বানমন্ত্র দিকে দিকে ঘোষিত।

আদিকালের মানুষ একদিন আগুনের রহস্য ভেদ করল, তাকে ব্যবহারে লাগালো। আগুনের সত্য কোনো বিশেষ কালে আবদ্ধ রইল না, সর্বমানব এই আশ্চর্য রহস্যের অধিকারী হল। তেমনি পরিধেয় বস্ত্র, ভূকর্ষণ প্রভৃতি প্রথম যুগের আবিষ্কার থেকে শুরু করে মানুষের সর্বত্র চেষ্টা ও সাধনার মধ্য দিয়ে যে জ্ঞানসম্পদ আমরা পেলেম, তা কোনো বিশেষ জাতির বা কালের নয়। এই কথা আমরা সম্যক্ উপলব্ধি করি না। আমাদের তেমনি দান চাই যা সর্বমানব গ্রহণ করতে পারে।

সর্বমানবের ত্যাগের ক্ষেত্রে আমরা জন্মেছি। ব্রহ্ম

যিনি, সৃষ্টির মধ্যেই আপনাকে উৎসর্গ করে তাঁর আনন্দ, তাঁর সেই ত্যাগের ক্ষেত্রে জীবসকল জীবিত থাকে এবং তাঁরই মধ্যে প্রবেশ করে ও বিলীন হয় —এ যেমন অধ্যাত্ম-লোকের কথা, তেমনি চিত্তলোকেও মানুষ মহামানবের ত্যাগের লোকে জন্মলাভ করেছে ও সঞ্চরণ করছে এই কথা উপলব্ধি করতে হবে ; তবেই আনুষঙ্গিক শিক্ষাকে আমরা পূর্ণতা ও সর্বাঙ্গীণতা দান করতে পারব।

আমার তাই সংকল্প ছিল যে, চিত্তকে বিশেষ জাতি ও ব্যক্তির মধ্যে আবদ্ধ না করে শিক্ষার ব্যবস্থা করব ; দেশের কঠিন বাধা ও অন্ধ সংস্কার সত্ত্বেও এখানে সর্বদেশের মানবচিত্তের সহযোগিতায় সর্বকর্মযোগে শিক্ষাসত্র স্থাপন করব ; শুধু ইতিহাস ভূগোল সাহিত্য -পাঠে নয়, কিন্তু সর্বশিক্ষার মিলনের দ্বারা এই সত্যসাধনা করব। এ অত্যন্ত কঠিন সাধনা, কারণ চারি দিকে দেশে এর প্রতিকূলতা আছে। দেশবাসীর যে আত্মাভিমান ও জাতি-অভিমানের সংকীর্ণতা তার সঙ্গে সংগ্রাম করতে হবে।

আমরা যে এখানে পূর্ণ সফলতা লাভ করেছি তা বলতে পারি না, কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানের অন্তর্নিহিত সেই সংকল্পটি আছে তা স্মরণ করতে হবে। শুধু কেবল আনুষঙ্গিক কর্মপদ্ধতি নিয়ে ব্যস্ত থাকলে তার জটিল জাল বিস্তৃত করে বাহ্যিক শৃঙ্খলা-পারিপাট্যের সাধন সম্ভব হতে পারে, কিন্তু আদর্শের খর্বতা হবে।

প্রথম যখন অল্প বালক নিয়ে এখানে শিক্ষায়তন খুলি

তখনও ফললাভের প্রতি প্রলোভন ছিল না। তখন সহায়ক হিসাবে কয়েকজন কর্মীকে পাই— যেমন, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, কবি সতীশচন্দ্র, জগদানন্দ। এঁরা তখন একটি ভাবের ঐক্যে মিলিত ছিলেন। তখনকার হাওয়া ছিল অন্যরূপ। কেবলমাত্র বিধি নিষেধের জালে জড়িত হয়ে থাকতেম না, অল্প ছাত্র নিয়ে তাদের সকলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগে আমাদের প্রাত্যহিক জীবন সত্য হয়ে উঠত। তাদের সেবার মধ্যে আমরা একটি গভীর আনন্দ, একটি চরম সার্থকতা উপলব্ধি করতেম। তখন অধ্যাপকদের মধ্যে অসীম ধৈর্য দেখেছি। মনে পড়ে, যেসব বালক দুরন্তপনায় দুঃখ দিয়েছে তাদের বিদায় দিই নি বা অন্যভাবে পীড়া দিই নি। যতদিন আমার নিজের হাতে এর ভার ছিল ততদিন বার বার তাদের ক্ষমা করেছি; অধ্যাপকদের ক্ষমা করেছি। সেইসকল ছাত্র পরে কৃতিত্ব লাভ করেছে।

তখন বাহ্যিক ফললাভের চিন্তা ছিল না, পরীক্ষার মার্কা-মারা করে দেবার ব্যস্ততা ছিল না, সকল ছাত্রকে আপন করবার চেষ্টা করেছি। তখন বিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্কিত ছিল না, তার থেকে নির্লিপ্ত ছিল। তখনকার ছাত্রদের মনে এই অনুষ্ঠানের প্রতি সুগভীর নিষ্ঠা লক্ষ্য করেছি।

এইভাবে বিদ্যালয় অনেকদিন চলেছিল। এর অনেক পরে এর পরিধির বিস্তার হয়। সৌভাগ্যক্রমে তখন

স্বদেশবাসীর সহায়তা পাই নি; তাদের অহৈতুক বিরুদ্ধতা ও অকারণ বিদ্বেষ একে আঘাত করেছে, কিন্তু তার প্রতি দৃক্‌পাত করি নি এবং এই-যে কাজ শুরু করলেম তার প্রচারেরও চেষ্টা করি নি। মনে আছে, আমার বন্ধুবর মোহিত সেন এই বিদ্যালয়ের বিবরণ পেয়ে আকৃষ্ট হন, আমাদের আদর্শ তাঁর মনকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। তিনি বলেন, 'আমি কিছু করতে পারলেম না, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের চাকুরি আমার জীবিকা— এখানে এসে কাজ করতে পারলে ধন্য হতাম। তা হল না। এবার পরীক্ষায় কিছু অর্জন করেছি, তার থেকে কিছু দেব এই ইচ্ছা।' এই বলে তিনি এক হাজার টাকার একটি নোট আমাকে দেন। বোধ হয় আমার প্রদেশবাসীর এই প্রথম ও শেষ সহানুভূতি। এইসঙ্গেই উল্লেখ করতে হবে আমার প্রতি প্রীতিপরায়ণ ত্রিপুরাধিপতির আনুকূল্য। আজও তাঁর বংশে তা প্রবাহিত হয়ে আসছে।

মোহিতবাবু অনেকদিন এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে আন্তরিক-ভাবে যুক্ত ছিলেন এবং আমার কী প্রয়োজন তার সন্ধান নিতেন। তিনি অনুমতি চাইলেন, এই বিদ্যালয়ের বিষয়ে কিছু কাগজে লেখেন। আমি তাতে আপত্তি জানাই। বললেম, 'গুটিকতক ছেলে নিয়ে গাছপালার মধ্যে বসেছি, কোনো বড়ো ঘরবাড়ি নেই, বাইরের দৃশ্য দীন, সর্বসাধারণ একে ভুল বুঝবে।'

এই অল্প অধ্যাপক ও ছাত্র নিয়ে আমি বহুকষ্টে আর্থিক

দুরবস্থা ও দুর্গতির চরম সীমায় উপস্থিত হয়ে যেভাবে এই বিদ্যালয় চালিয়েছি তার ইতিহাস রক্ষিত হয় নি। কঠিন চেষ্টার দ্বারা ঋণ করে প্রতিদিনের প্রয়োজন জোগাতে সর্বস্বান্ত হয়ে দিন কাটিয়েছি, কিন্তু পরিতাপ ছিল না। কারণ, গভীর সত্য ছিল এই দৈন্যদশার অন্তরালে। যাক, এ আলোচনা বৃথা। কর্মের যে ফল তা বাইরের বিধানে দেখানো যায় না, প্রাণশক্তির যে রসসঞ্চার তা গোপন গূঢ়, তা ডেকে দেখাবার জিনিস নয়। সেই গভীর কাজ সকল-প্রকার বিরুদ্ধতার মধ্যেও এখানে চলেছিল।

এই নির্মম বিরুদ্ধতার উপকারিতা আছে— যেমন জমির অনুর্বরতা কঠিন প্রযত্নের দ্বারা দূর করে তবে ফসল ফলাতে হয়, তবেই তার উৎপাদনী শক্তি হয়, তার রস-সঞ্চার হয়। দুঃখের বিষয়, বাংলার চিত্তক্ষেত্র অনুর্বর, কোনো প্রতিষ্ঠানকে স্থায়ী করবার পক্ষে তা অনুকূল নয়। বিনা কারণে বিদ্বেষের দ্বারা পীড়া দেয় যে দুর্বুদ্ধি তা গড়া জিনিসকে ভাঙে, সংকল্পকে আঘাত করে, শ্রদ্ধার সঙ্গে কিছুকে গ্রহণ করে না। এখানকার এই-যে প্রচেষ্টা রক্ষিত হয়েছে, তা কঠিনতাকে প্রতিহত করেই বেঁচেছে। অর্থবর্ষণের প্রশ্রয় পেলে হয়তো এর আত্মসত্য রক্ষা করা দুরূহ হত, অনেক জিনিস আসত খ্যাতির দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে যা বাঞ্ছনীয় নয়। তাই এই অখ্যাতির মধ্য দিয়ে এই বিদ্যালয় বেঁচে উঠেছে।

এক সময় এল, যখন এর পরিধি বাড়বার দিকে গেল।

বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় বললেন, দেশের যে টোল চতুষ্পাঠী আছে তা সংকীর্ণ, তা একালের উপযোগী নয়, তাকে বিস্তৃত করে পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করে দেশের শিক্ষাপ্রণালীকে কালোপযোগী করতে হবে। আমারও এই কথাটা মনে লেগেছিল। আমার তখনকার বিদ্যালয় শুধু বালকদের শিক্ষায়তন ছিল, এতবড়ো বৃহৎ অনুষ্ঠানের কথা মনে হয় নি এবং তাতে সফলকাম হব বলেও ভাবি নি। শাস্ত্রীমশায় তখন কাশীতে সংস্কৃত মাসিকপত্রের সম্পাদন ও সাহিত্যচর্চা করছিলেন। তিনি এখানে এসে জুটলেন। তখন পালিভাষা ও শাস্ত্রে তিনি প্রবীণ ছিলেন না, প্রথম আমার অনুরোধেই তিনি এই শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করতে ব্রতী হলেন।

ধীরে ধীরে এখানকার কাজ আরম্ভ হল। আমার মনে হল যে, দেশের শিক্ষাপ্রণালীর ব্যাপকতাসাধন করতে হবে। তখন এমন কোনো বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না যেখানে সর্বদেশের বিদ্যাকে গৌরবের স্থান দেওয়া হয়েছে। সব য়ুনিভার্সিটিতে শুধু পরীক্ষা-পাসের জন্যই পাঠ্যবিধি হয়েছে, সেই শিক্ষা-ব্যবস্থা স্বার্থসাধনের দীনতায় পীড়িত, বিদ্যাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণের কোনো চেষ্টা নেই। তাই মনে হল, এখানে মুক্ত-ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শাসনের বাইরে এমন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলব যেখানে সর্ববিদ্যার মিলনক্ষেত্র হবে। সেই সাধনার ভার যাঁরা গ্রহণ করলেন, ধীরে ধীরে তাঁরা এসে জুটলেন।

আমার শিশুবিদ্যালয়ের বিস্তৃতি সাধন হল— সভা-

সমিতি মন্ত্রণাসভা ডেকে নয়, অল্পপরিসর প্রারম্ভ থেকে ধীরে ধীরে এর বৃদ্ধি হল। তার পর কালক্রমে কী করে এর কর্মপরিধি ব্যাপ্ত হল তা সকলে জানেন।

আমাদের কাজ যে কিছু সফল হয়েছে আমাদের কর্মীদের চোখে তার স্পষ্ট প্রতিরূপ ধরা পড়ে না, তারা সন্দিগ্ধ হয়, বাহ্যিক ফলে অসন্তোষ প্রকাশ করে। তাই এক-একবার আমাদের কর্মে সার্থকতা কোথায় তা দেখতে ইচ্ছা হয়, নইলে পরিতুষ্টি হয় না। এবার কলকাতা থেকে আসবার পর নিকটবর্তী গ্রামের লোকেরা আমায় নিয়ে গেল— তাদের মধ্যে গিয়ে বড়ো আনন্দ হল, মনে হল এই তো ফললাভ হয়েছে; এই জায়গায় শক্তি প্রসারিত হল, হৃদয়ে হৃদয়ে তা বিস্তৃত হল। পরীক্ষার ফল ছোটো কথা— এই তো ফললাভ, আমরা মানুষের মনকে জাগাতে পেরেছি। মানুষ বুঝেছে, আমরা তাদের আপন। গ্রামবাসীদের সরল হৃদয়ে এখানকার প্রভাব সঞ্চারিত হল, তাদের আত্মশক্তির উদ্‌বোধন হল।

আমার মরবার আগে এই ব্যাপার দেখে খুশি হয়েছি। এই-যে এরা ভালোবেসে ডাকল, এরা আমাদের কাছে থেকে শ্রদ্ধা ও শক্তি পেয়েছে। এ জনতা ডেকে 'মহতী সভা' করা নয়, খবরের কাগজের লক্ষগোচর কিছু ব্যাপার নয়। কিন্তু এই গ্রামবাসীর ডাক, এ আমার হৃদয়ে স্পর্শ করল। মনে হল দীপ জ্বলেছে, হৃদয়ে হৃদয়ে তার শিখা প্রদীপ্ত হল, মানুষের শক্তির আলোক হৃদয়ে হৃদয়ে উদ্‌ভাসিত হল।

বিশ্বভারতী

এই-যে হল, এ কোনো একজনের কৃতিত্ব নয়। সকল কর্মীর চেষ্টা চিন্তা ও ত্যাগের দ্বারা, সকলের মিলিত কর্ম এই সমগ্রকে পুষ্ট করেছে। তাই ভরসার কথা, এ কৃত্রিম উপায়ে হয় নি। কোনো ব্যক্তিবিশেষকে আশ্রয় করে এ কাজ হয় নি। ভয় নেই, প্রাণশক্তির সঞ্চার হয়েছে, আমাদের অবর্তমানে এই অনুষ্ঠান জীর্ণ ও লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে না।

আমরা জনসাধারণকে আপন সংকল্পের অন্তর্গত করতে পেরেছি— এই প্রতিষ্ঠান তার অভিমুখে চলেছে। অল্প পরিমাণে এক জায়গাতেই আমরা ভারতের সমস্যার সমাধান করব। রাজনীতির ঔদ্ধত্যে নয়, সহজভাবে দেশবাসীদের আত্মীয়রূপে বরণ করে তাদের নিয়ে এখানে কাজ করব। তাদের ভোটাধিকার নিয়ে বিশ্ববিজয়ী হতে না পারি, তাদের সঙ্গে চিত্তের আদানপ্রদান হবে, তাদের সেবায় নিযুক্ত হব। তারাও দেবে, আমাদের কাছ থেকে নেবে, এই সর্বভারতের কাজ এখানে হবে।

এক সময়ে আমার কাছে প্রশ্ন আসে— তৎকালীন স্বদেশী আন্দোলনে কেন যোগ দিচ্ছি না। আমি বলি— সকলের মধ্যে যে উত্তেজনা আমার কাজকে তা অগ্রসর করবে না। শুধু একটি বিশেষ প্রণালীর দ্বারাই যে সত্য-সাধনা হয় আমি তা মনে করি না। তাই আমি বলি যে, এই প্রশ্নের উত্তর যখন এখানে পূর্ণ হয়ে উঠবে তখন একদিন তা সকলের গোচর হবে। যা আমি সত্য বলে মনে করেছি সে উত্তরের জোগান হয়তো এখান থেকেই হবে।

সেই অপেক্ষায় ছিলুম। সত্যের মধ্যে সংকীর্ণতা নেই— সকল বিভাগে মনুষ্যত্বের সাধনা প্রসারিত। দল বাড়াবার সংকীর্ণ চেষ্টার মধ্যে সেই সত্যের খর্বতা হয়।

আধুনিক কালের মানুষের ধারণা যে, বিজ্ঞাপনের দ্বারা সংকল্পের ঘোষণা করতে হয়। দেখি যে, আজকাল কখনও কখনও বিশ্বভারতীর কর্ম নিয়ে পত্রলেখকেরা সংবাদপত্রে লিখে থাকেন। এতে ভয় পাই, এ দিকে লক্ষ্য হলে সত্যের চেয়ে খ্যাতিকে বড়ো করা হয়। সত্য স্বল্পকে অবজ্ঞা করে না, অবাস্তবকে ভয় করে, তাই খ্যাতির কোলাহলকে আশ্রয় করতে সে কুণ্ঠিত। কিন্তু আধুনিক কালের ধর্ম— ব্যাপ্তির দ্বারা কাজকে বিচার করা, গভীরতার দ্বারা নয়। তার পরিণাম হয় গাছের ডালপালার পরিব্যাপ্তির মতো, তাতে ফল হয় কম।

আমি এক সময়ে নিভৃতে দুঃখ পেয়েছি অনেক, কিন্তু তাতে শান্তি ছিল। আমি খ্যাতি চাই নি, পাই নি ; বরং অখ্যাতিই ছিল। মনু বলেছেন— সম্মানকে বিষের মতো জানবে। অনেক কাল কর্মের পুরস্কার-স্বরূপে সম্মানের দাবি করি নি। একলা আপনার কাজ করেছি, সহ-যোগিতার আশা ছেড়েই দিয়েছি। আশা করলে পাবার সম্ভাবনা ছিল না। তেমন স্থলে বাহ্যিকভাবে না পাওয়াই স্বাস্থ্যজনক।

বিশ্বভারতীর এই প্রতিষ্ঠান যে যুগে যুগে সার্থক হতেই থাকবে, তা বলে নিজেকে ভুলিয়ে কী হবে।

মোহমুক্ত মনে নিরাশী হয়েই যথাসাধ্য কাজ করে যেতে পারি যেন। বিধাতা আমাদের কাছে কাজ দাবি করেন কিন্তু আমরা তাঁর কাছে ফল দাবি করলে তিনি তার হিসাব গোপনে রাখেন, নগদ মজুরি চুকিয়ে দিয়ে আমাদের প্রয়াসের অবমাননা করেন না। তা ছাড়া আজ আমরা যে সংকল্প করেছি আগামী কালেও যে অবিকল তারই পুনরাবৃত্তি চলবে, কালের সে ধর্ম নয়। ভাবী কালের দিকে আমরা পথ তৈরি করে দিতে পারি, কিন্তু গম্য স্থানকে আমার আজকের দিনের রুচি ও বুদ্ধি দিয়ে একেবারে পাকা করে দেব, এ হতেই পারে না। যদি অন্ধ মমতায় তাই করে দিই তা হলে সে আমাদের মৃত সংকল্পের সমাধিস্থান হবে। আমাদের যে চেষ্টা বর্তমানে জন্মগ্রহণ করে, সময় উপস্থিত হলে তার অন্ত্যেষ্টিসংকার হবে, তার দ্বারা সত্যের দেহ-মুক্তি হবে, কিন্তু তার পরে নবজন্মে তার নবদেহধারণের আহ্বান আসবে এই কথা মনে রেখে—

> নাভিনন্দেত মরণং নাভিনন্দেত জীবিতম্।
> কালমেব প্রতীক্ষেত নির্দেশং ভৃতকো যথা॥

৯ পৌষ ১৩৩৯

শান্তিনিকেতন

১৬

প্রৌঢ় বয়সে একদা যখন এই বিদ্যায়তনের প্রতিষ্ঠা করেছিলেম তখন আমার সম্মুখে ভাসছিল ভবিষ্যৎ, পথ তখন লক্ষ্যের অভিমুখে, অনাগতের আহ্বান তখন ধ্বনিত — তার ভাবরূপ তখনও অস্পষ্ট, অথচ এক দিক দিয়ে তা এখনকার চেয়ে অধিকতর পরিস্ফুট ছিল। কারণ, তখন যে আদর্শ মনে ছিল তা বাস্তবের অভিমুখে আপন অখণ্ড আনন্দ নিয়ে অগ্রসর হয়েছিল। আজ আমার আয়ুষ্কাল শেষপ্রায়, পথের অন্য প্রান্তে পৌঁছিয়ে পথের আরম্ভসীমা দেখবার সুযোগ হয়েছে, আমি সেই দিকে গিয়েছি— যেমন-তর সূর্য যখন পশ্চিম-অভিমুখে অস্তাচলের তটদেশে তখন তার সামনে থাকে উদয়দিগন্ত, যেখানে তার প্রথম যাত্রারম্ভ।

অতীত কাল সম্বন্ধে আমরা যখন বলি তখন আমাদের হৃদয়ের পূর্বরাগ অত্যুক্তি করে, এমন বিশ্বাস লোকের আছে। এর মধ্যে কিছু সত্য আছে, কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য নেই। যে দূরবর্তী কালের কথা আমরা স্মরণ করি তার থেকে যা-কিছু অবান্তর তা তখন স্বতই মন থেকে ঝরে পড়েছে। বর্তমান কালের সঙ্গে যত-কিছু আকস্মিক, যা-কিছু অসংগত সংযুক্ত থাকে, তা তখন স্খলিত হয়ে ধূলি-বিলীন ; পূর্বে নানা কারণে যার রূপ ছিল বাধাগ্রস্ত, তার সেই বাধার কঠোরতা আজ আর পীড়া দেয় না। এইজন্য

গতকালের যে চিত্র মনের মধ্যে প্রকাশ পায় তা সুসম্পূর্ণ, যাত্রারম্ভের সমস্ত উৎসাহ স্মৃতিপটে তখন ঘনীভূত। তার মধ্যে এমন অংশ থাকে না যা প্রতিবাদরূপে অন্য অংশকে খণ্ডিত করতে থাকে। এইজন্যই অতীত স্মৃতিকে আমরা নিবিড়ভাবে মনে অনুভব করে থাকি। কালের দূরত্বে, যা যথার্থ সত্য তার বাহ্যরূপের অসম্পূর্ণতা ঘুচে যায়, সাধনার কল্পমূর্তি অক্ষুণ্ণ হয়ে দেখা দেয়।

প্রথম যখন এই বিদ্যালয় আরম্ভ হয়েছিল তখন এর আয়োজন কত সামান্য ছিল, সেকালে এখানে যারা ছাত্র ছিল তারা তা জানে। আজকের তুলনায় তার উপকরণ-বিরলতা, সকল বিভাগেই তার অকিঞ্চনতা, অত্যন্ত বেশি ছিল। কটি বালক ও দুই-এক জন অধ্যাপক নিয়ে বড়ো জামগাছতলায় আমাদের কাজের সূচনা করেছি। একান্তই সহজ ছিল তাদের জীবনযাত্রা— এখনকার সঙ্গে তার প্রভেদ গুরুতর। এ কথা বলা অবশ্যই ঠিক নয় যে, এই প্রকাশের ক্ষীণতাতেই সত্যের পূর্ণতর পরিচয়। শিশুর মধ্যে আমরা যে রূপ দেখি তার সৌন্দর্যে আমাদের মনে আনন্দ জাগায়, কিন্তু তার মধ্যে প্রাণরূপের বৈচিত্র্য ও বহুধাশক্তি নেই। তার পূর্ণ মূল্য ভাবী কালের প্রত্যাশার মধ্যে। তেমনি আশ্রমের জীবনযাত্রার যে প্রথম উপক্রম, বর্তমানে সে ছিল ছোটো, ভবিষ্যতেই সে ছিল বড়ো। তখন যা ইচ্ছা করেছিলাম তার মধ্যে কোনো সংশয় ছিল না। তখন আশা ছিল অমৃতের অভিমুখে, যে সংসার উপকরণবহুলতায়

প্রতিষ্ঠিত তা পিছনে রেখেই সকলে এসেছিলেন। যাঁরা এখানে আমার কর্মসঙ্গী ছিলেন, অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন তাঁরা। আজ মনে পড়ে— কী কষ্টই না তাঁরা এখানে পেয়েছেন, দৈহিক সাংসারিক কত দীনতাই না তাঁরা বহন করেছেন। প্রলোভনের বিষয় এখানে কিছুই ছিল না, জীবনযাত্রার সুবিধা তো নয়ই, এমন-কি খ্যাতিরও না— অবস্থার ভাবী উন্নতির আশা মরীচিকারূপেও তখন দূরদিগন্তে ইন্দ্রজাল বিস্তার করে নি। কেউ তখন আমাদের কথা জানত না, জানাতে ইচ্ছাও করি নি। এখন যেমন সংবাদপত্রের নানা ছোটোবড়ো জয়ঢাক আছে যা সামান্য ঘটনাকে শব্দায়িত করে রটনা করে, তার আয়োজনও তখন এমন ব্যাপক ছিল না। এই বিদ্যালয়ের কথা ঘোষণা করতে অনেক বন্ধু ইচ্ছাও করেছেন, কিন্তু আমরা তা চাই নি। লোকচক্ষুর অগোচরে, বহু দুঃখের ভিতর দিয়ে সে ছিল আমাদের যথার্থ তপস্যা। অর্থের এত অভাব ছিল যে, আজ জগদ্‌ব্যাপী দুঃসময়েও তা কল্পনা করা যায় না। আর সে কথা কোনোকালে কেউ জানবেও না, কোনো ইতিহাসে তা লিখিত হবে না। আশ্রমের কোনো সম্পত্তি ছিল না, সহায়তা ছিল না— চাইও নি। এইজন্যই, যাঁরা তখন এখানে কাজ করেছেন তাঁরা অন্তরে দান করেছেন, বাইরে কিছু নেন নি। যে আদর্শে আকৃষ্ট হয়ে এখানে এসেছি তার বোধ সকলেরই মনে যে স্পষ্ট বা প্রবল ছিল তা নয়, কিন্তু অল্প পরিসরের মধ্যে তা নিবিড় হতে

পেয়েছিল। ছাত্রেরা তখন আমাদের অত্যন্ত নিকটে ছিল, অধ্যাপকেরাও পরস্পর অত্যন্ত নিকটে ছিলেন— পরস্পরের সুহৃৎ ছিলেন তাঁরা। আমাদের দেশের তপোবনের আদর্শ আমি নিয়েছিলাম। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সে আদর্শের রূপের পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু তার মূল সত্যটি ঠিক আছে—সেটি হচ্ছে, জীবিকার আদর্শকে স্বীকার করে তাকে সাধনার আদর্শের অনুগত করা। এক সময়ে এটা অনেকটা সুসাধ্য হয়েছিল, যখন জীবনযাত্রার পরিধি ছিল অনতিবৃহৎ। তাই বলেই সেই স্বল্পায়তনের মধ্যে সহজ জীবনযাত্রাই শ্রেষ্ঠ আদর্শ, এ কথা সম্পূর্ণ সত্য নয়। উচ্চতর সংগীতে নানা ত্রুটি ঘটতে পারে; একতারায় ভুলচুকের সম্ভাবনা কম, তাই বলে একতারাই শ্রেষ্ঠ এমন নয়। বরঞ্চ কর্ম যখন বহুবিস্তৃত হয়ে বন্ধুর পথে চলতে থাকে তখন তার সকল ভ্রমপ্রমাদ সত্ত্বেও যদি তার মধ্যে প্রাণ থাকে তবে তাকেই শ্রদ্ধা করতে হবে। শিশু-অবস্থার সহজতাকে চিরকাল বেঁধে রাখবার ইচ্ছা ও চেষ্টার মতো বিড়ম্বনা আর কী আছে। আমাদের কর্মের মধ্যেও সেই কথা। যখন একলা ছোটো কার্যক্ষেত্রের মধ্যে ছিলুম তখন সব কর্মীদের মনে এক অভিপ্রায়ের প্রেরণা সহজেই কাজ করত। ক্রমে ক্রমে যখন এ আশ্রম বড়ো হয়ে উঠল তখন একজনের অভিপ্রায় এর মধ্যে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ পাবে এ সম্ভব হতে পারে না। অনেকে এখানে এসেছেন, বিচিত্র তাঁদের শিক্ষাদীক্ষা— সকলকে নিয়েই আমি কাজ

করি, কাউকে বাছাই করি নে, বাদ দিই নে ; নানা ভুলত্রুটি ঘটে, নানা বিদ্রোহ-বিরোধ ঘটে —এ-সব নিয়েই জটিল সংসারে জীবনের যে প্রকাশ ঘাতাভিঘাতে সর্বদা আন্দোলিত, তাকে আমি সম্মান করি। আমার প্রেরিত আদর্শ নিয়ে সকলে মিলে একতারা-যন্ত্রে গুঞ্জরিত করবেন এমন অতি সরল ব্যবস্থাকে আমি নিজেই শ্রদ্ধা করি নে। আমি যাকে বড়ো বলে জানি, শ্রেষ্ঠ বলে যা বরণ করেছি, অনেকের মধ্যে তার প্রতি নিষ্ঠার অভাব আছে জানি, কিন্তু তা নিয়ে নালিশ করতে চাই নে। আজ আমি বর্তমান থাকা সত্ত্বেও এখানকার যা কর্ম তা নানা বিরোধ ও অসংগতির মধ্য দিয়ে প্রাণের নিয়মে আপনি তৈরি হয়ে উঠছে ; আমি যখন থাকব না তখনও অনেক চিত্তের সমবেত উদ্যোগে যা উদ্‌ভাবিত হতে থাকবে, তাই হবে সহজ সত্য। কৃত্রিম হবে যদি কোনো এক ব্যক্তি নিজের আদেশ-নির্দেশে একে বাধ্য করে চালায়— প্রাণধর্মের মধ্যে স্বতোবিরোধিতাকেও স্বীকার করে নিতে হয় ।

অনেক দিন পরে আজ এ আশ্রমকে সমগ্র করে দেখতে পাচ্ছি ; দেখছি আপন নিয়মে এ আপনি গড়ে উঠেছে। গঙ্গা যখন গঙ্গোত্রীর মুখে তখন একটিমাত্র তার ধারা। তার পর ক্রমে বহু নদনদীর সহিত যতই সে সংগত হল, সমুদ্রের যত নিকটবর্তী হল, কত তার রূপান্তর ঘটেছে। সেই আদিম স্বচ্ছতা আর তার নেই ; কত আবিলতা প্রবেশ করেছে তার মধ্যে ; তবু কেউ বলে না গঙ্গার

উচিত ফিরে যাওয়া, যেহেতু অনেক মলিনতা ঢুকেছে তার মধ্যে, সে সরল গতি আর তার নেই। সব নিয়ে যে সমগ্রতা সেইটিই বড়ো— আশ্রমও স্বতোধাবিত হয়ে সেই পথেই চলেছে, অনেক মানুষের চিত্তসম্মিলনে আপনি গড়ে উঠছে। অবশ্য এর মধ্যে একটা ঐক্য এনে দেয় মূলগত একটা আদিম বেগ ; তারও প্রয়োজন আছে, অথচ এর গতি প্রবল হয় সকলের সম্মিলনে। নিত্যকালের মতো কিছুই কল্পনা করা চলে না— তবে এর মূলগত একটি গভীর তত্ত্ব বরাবর থাকবে এ কথা আমি আশা করি— সে কথা এই যে, এটা বিদ্যাশিক্ষার একটা খাঁচা হবে না, এখানে সকলে মিলে একটি প্রাণলোক সৃষ্টি করবে। এমনতরো স্বর্গলোক কেউ রচনা করতে পারে না যার মধ্যে কোনো কলুষ নেই, দুঃখজনক কিছু নেই ; কিন্তু বন্ধুরা জানবেন যে, এর মধ্যে যা নিন্দনীয় সেইটাই বড়ো নয়। চোখের পাতা ওঠে, চোখের পাতা পড়ে ; কিন্তু পড়াটাই বড়ো নয়, সেটাকে বড়ো বললে অন্ধতাকে বড়ো বলতে হয়। যাঁরা প্রতিকূল, নিন্দার বিষয় তাঁরা পাবেন না এমন নয়— নিন্দনীয়তার হাত থেকে কেউই রক্ষা পেতে পারে না। কিন্তু তাকে পরাস্ত করে উত্তীর্ণ হয়েও টিকে থাকাতেই প্রাণের প্রমাণ। আমাদের দেহের মধ্যে নানা শত্রু নানা রোগের বীজাণু— তাকে আলাদা করে যদি দেখি তো দেখব প্রত্যেক মানুষ বিকৃতির আলয়। কিন্তু আসলে রোগকে পরাস্ত করে যে স্বাস্থ্যকে দেখা যাচ্ছে সেইটেই সত্য।

দেহের মধ্যে যেমন লড়াই চলছে, প্রত্যেক অনুষ্ঠানের মধ্যেই তেমনি ভালোমন্দের একটা দ্বন্দ্ব আছে— কিন্তু সেটা পিছন দিকের কথা। এর মধ্যে স্বাস্থ্যের তত্ত্বটাই বড়ো।

আমি এমন কথা কখনও বলি নি, আজও বলি নে যে, আমি যে কথা বলব তাই বেদবাক্য— সেরকম অধিনেতা আমি নই। অসাধারণ তত্ত্ব তো আমি কিছু উদ্‌ভাবন করি নি ; সাধকেরা যে অখণ্ড পরিপূর্ণ জীবনের কথা বলেন সে কথা যেন সকলে স্বীকার করে নেন। এই একটি কথা ধ্রুব হয়ে থাক্। তার পরে পরিবর্তমান পরিবর্ধমান সৃষ্টির কাজ সকলে মিলেই হবে। মানুষের দেহে যেমন অস্থি, এই অনুষ্ঠানের মধ্যেও তেমনি একটি যান্ত্রিক দিক আছে। এই অনুষ্ঠান যেন প্রাণবান হয়, কিন্তু যন্ত্রই যেন মুখ্য না হয়ে ওঠে ; হৃদয়-প্রাণ-কল্পনার সঞ্চরণের পথ যেন থাকে। আমি কল্পনা করি, এখানকার বিদ্যালয়ের আস্বাদন এক সময়ে যাঁরা পেয়েছেন, এখানকার প্রাণের সঙ্গে প্রাণকে মিলিয়েছেন, অনেক সময় হয়তো তাঁরা এখানে অনেক বাধা পেয়েছেন, দুঃখ পেয়েছেন, কিন্তু দূরে গেলেই পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে পান এখানে যা বড়ো যা সত্য। আমার বিশ্বাস, সেই দৃষ্টিমান অনেক ছাত্র ও কর্মী নিশ্চয়ই আছেন, নইলে অস্বাভাবিক হত। এক সময়ে তাঁরা এখানে নানা আনন্দ পেয়েছেন, সখ্যবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন— এর প্রতি তাঁদের মমতা থাকবে না এ হতেই পারে না। আমি আশা করি, কেবল নিষ্ক্রিয় মমতা-দ্বারা নয়, এই অনুষ্ঠানের অন্তর্বর্তী হয়ে

যদি তাঁরা এর শুভ ইচ্ছা করেন, তবে এর প্রাণের ধারা অব্যাহত থাকতে পারবে, যন্ত্রের কঠিনতা বড়ো হয়ে উঠতে পারবে না। এক সময়ে এখানে যাঁরা ছাত্র ছিলেন, যাঁরা এখানে কিছু পেয়েছেন, কিছু দিয়েছেন, তাঁরা যদি অন্তরের সঙ্গে একে গ্রহণ করেন তবেই এ প্রাণবান হবে। এইজন্য আজ আমার এই ইচ্ছা প্রকাশ করি যে, যাঁরা জীবনের অর্ঘ্য এখানে দিতে চান, যাঁরা মমতা-দ্বারা একে গ্রহণ করতে চান, তাঁদের অন্তর্বর্তী করে নেওয়া যাতে সহজ হয় সেই প্রণালী যেন আমরা অবলম্বন করি। যাঁরা একদা এখানে ছিলেন তাঁরা সম্মিলিত হয়ে এই বিদ্যালয়কে পূর্ণ করে রাখুন এই আমার অনুরোধ। অন্যসব বিদ্যালয়ের মতো এ আশ্রম যেন কলের জিনিস না হয়— তা করব না বলেই এখানে এসেছিলাম। যন্ত্রের অংশ এসে পড়েছে, কিন্তু সবার উপরে প্রাণ যেন সত্য হয়। সেইজন্যই আহ্বান করি তাঁদের যাঁরা এক সময়ে এখানে ছিলেন, যাঁদের মনে এখনও সেই স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে আছে। ভবিষ্যতে যদি আদর্শের প্রবলতা ক্ষীণ হয়ে আসে তবে সেই পূর্বতনেরা যেন একে প্রাণ-ধারায় সঞ্জীবিত করে রাখেন, নিষ্ঠা দ্বারা শ্রদ্ধা দ্বারা এর কর্মকে সফল করেন —এই আশ্বাস পেলেই আমি নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারি।

৮ পৌষ ১৩৪১

শান্তিনিকেতন

১৭

এই আশ্রমবিদ্যালয়ের কোথা থেকে আরম্ভ, কোন্ সংকল্প নিয়ে কিসের অভিমুখে এ চলেছে, সে কথা প্রতি বর্ষে একবার করে ভাববার সময় আসে— বিশেষ করে আমার —কেননা অনুভব করি, আমার বলবার সময় আর বেশি নেই। এর ইতিহাস বিশেষ নেই; যে কাজের ভার নিয়েছিলাম তা নিজের প্রকৃতিসংগত নয়। পূর্বে সমাজ থেকে দূরে কোণে মানুষ হয়েছি; আমি যে পরিবারে মানুষ হয়েছিলাম, লোকসমাজের সঙ্গে সংযোগ ছিল তার অল্প। যখন সাহিত্যে প্রবৃত্ত হলাম সে সময়ও নিভৃতে নদীতীরে কাটিয়েছি। এমন সময় এই বিদ্যালয়ের আহ্বান এল। এই কথাটা অনুভব করেছিলাম, শহরের খাঁচায় আবদ্ধ হয়ে মানবশিশু নির্বাসনদণ্ড ভোগ করে, তার শিক্ষাও বিদ্যালয়ে সংকীর্ণ পরিধিতে সীমাবদ্ধ। গুরুর শাসনে তারা অনেক দুঃখ পায়, এ সম্বন্ধে আমার নিজেরও অভিজ্ঞতা আছে। কখনও ভাবি নি, আমার দ্বারা এর কোনো উপায় হবে। তবু একদিন নদীতীর ছেড়ে এখানে এসে আহ্বান করলুম ছেলেদের। এখানকার কাজে প্রথমে যে উৎসাহ এসেছিল সেটা সৃষ্টির আনন্দ; শিক্ষাকে লোকহিতের দিক থেকে জনসেবার অঙ্গ করে দেখা যায়— সে দিক থেকে আমি এখানে কাজ আরম্ভ করি নি। প্রকৃতির সৌন্দর্যের

মধ্যে মানুষ হয়ে এখানকার ছেলেদের মন বিকশিত হবে, আবরণ ঘুচে যাবে, কল্পনায় এই রূপ দেখতে পেতাম। যখন জানলুম, এ কাজের ভার নেবার আর কেউ নেই, তখন অনভিজ্ঞতা সত্ত্বেও এ ভার আমি নিয়েছিলাম। আমি মনে করেছিলাম, আমার ছেলেরা প্রাণবান হবে, তাদের মধ্যে ঔৎসুক্য জাগরিত হবে। তারা বেশি পাস-মার্কা পেয়ে ভালো করে পাস করবে এ লোভ ছিল না— তারা আনন্দিত হবে, প্রকৃতির শুশ্রূষায় শিক্ষকের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তায় পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হবে এই ইচ্ছাই মনে ছিল। অল্প কয়েকটি ছেলে নিয়ে গাছের তলায় এই লক্ষ্য নিয়েই কাজ আরম্ভ করেছিলাম। প্রকৃতির অবাধ সঙ্গ লাভ করবার উন্মুক্ত ক্ষেত্র এখানেই ছিল; শিক্ষায় যাতে তারা আনন্দ পায়, উৎসাহ বোধ করে, সেজন্য সর্বদা চেষ্টা করেছি, ছেলেদের রামায়ণ মহাভারত পড়ে শুনিয়েছি; অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় তখন এখানে আসতেন, তিনি তা শুনতে ছাত্র হয়ে আসতে পারবেন না বলে আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন। ছেলেদের জন্য নানারকম খেলা মনে মনে আবিষ্কার করেছি, একত্র হয়ে তাদের সঙ্গে অভিনয় করেছি, তাদের জন্য নাটক রচনা করেছি। সন্ধ্যার অন্ধকারে যাতে তারা দুঃখ না পায় এজন্য তাদের চিত্ত-বিনোদনের নূতন নূতন উপায় সৃষ্টি করেছি— তাদের সমস্ত সময়ই পূর্ণ করে রাখবার চেষ্টা করেছি। আমার নাটক গান তাদের জন্যই আমার রচনা। তাদের খেলা-

ধুলোয়ও তখন আমি যোগ দিয়েছি। এইসব ব্যবস্থা অন্যত্র শিক্ষাবিধির অন্তর্গত নয়। অন্য বিদ্যালয়ে ক্রিয়াপদ শব্দরূপ হয়তো বিশুদ্ধভাবে মুখস্থ করানো হচ্ছে— অভিভাবকের দৃষ্টিও সেই দিকেই। আমাদের হয়তো সে দিকে কিছু ত্রুটি হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু এ কথা বলতেই হবে যে, এখানে ছাত্রদের সহজ মুক্তির আনন্দ দিয়েছি। সর্বদা তাদের সঙ্গী হয়ে ছিলাম— মাত্র দশটা-পাঁচটা নয়, শুধু তাদের নির্দিষ্ট পাঠের মধ্যে নয়— তাদের আপন অন্তরের মধ্যে তাদের জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছি। কোনো নিয়ম -দ্বারা তারা পিষ্ট না হয়, এই আমার মনে অভিপ্রায় ছিল। এই চেষ্টায় সঙ্গী পেয়েছিলুম কিশোর কবি সতীশচন্দ্রকে— শিক্ষাকে তিনি আনন্দে সরস করে তুলতে পেরেছিলেন, সেক্স্‌পীয়রের মতো কঠিন বিষয়কেও তিনি অধ্যাপনার গুণে শিশুদের মনে মুদ্রিত করে দিতে পেরেছিলেন। তার পরে ক্রমশ নানা ঋতু-উৎসবের প্রচলন হয়েছে; আপনার অজ্ঞাতসারে প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের আনন্দের যোগ এই উৎসবের সহযোগে গড়ে উঠবে এই আমার লক্ষ্য ছিল।

ছাত্রসংখ্যা তখন অল্প ছিল এও একটা সুযোগ ছিল, নইলে আমার পক্ষে একলা এর ভার গ্রহণ করা অসম্ভব হত। সকল ছাত্র-শিক্ষকে মিলে তখন এক হয়ে উঠেছিলেন, কাজেই সকলকে এক অভিপ্রায়ে চালিত করা সহজ হয়েছিল।

ক্রমে বিদ্যালয় বড়ো হয়ে উঠেছে। আমি যখন এর জন্য দায়ী ছিলুম তখন অনেক সংকট এসেছে, সবই সহ্য করেছি; অনেক সময় বহুসংখ্যক ছাত্রকে বিদায় করতে হয়েছে, তার যা আর্থিক ক্ষতি যেমন করে পারি বহন করেছি। কেবল এইটুকু লক্ষ্য রেখেছি, যেন ছাত্র শিক্ষক এক আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে চলেন। ক্রমে যেটা সহজ পন্থা বিদ্যালয় সেই দিকেই চলেছে বলে মনে হয়— শিক্ষার যেসব প্রণালী সাধারণত প্রচলিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবি, সেইগুলিই বলবান হয়ে ওঠে, তার নিজের ধারা বদলে গিয়ে হাই-ইস্কুলের চলতি ছাঁচের প্রভাব প্রবল হয়ে ওঠে, কেননা সেই দিকেই ঝোঁক দেওয়া সহজ; সফলতার আদর্শ প্রচলিত আদর্শের দিকে ঝুঁকে পড়ে। মাঝখানে এল কনস্টিট্যুশন, ঠিক হল বিদ্যালয় ব্যক্তির অধীনে থাকবে না, সর্বসাধারণের রুচিই একে পরিচালিত করবে। আমার কবিপ্রকৃতি ব'লেই হয়তো কনস্টিট্যুশন, নিয়মের কাঠামো, যাতে প্রাণধর্মের চেয়ে কৃত্রিম উপায়ের উপর বেশি জোর, তা আমি বুঝতে পারি নে; সৃষ্টির কার্যে এটা বাধা দেয় বলেই আমার মনে হয়। যাই হোক, কনস্টিট্যুশনে নির্ভর রেখে আমি এর মধ্য থেকে অবকাশ নিয়েছি; কিন্তু এ কথা তো ভুলতে পারি নে যে, এ বিদ্যালয়ের কোনো বিশেষত্ব যদি অবশিষ্ট না থাকে তবে নিজেকে বঞ্চিত করা হয়। সাধ্যের বেশি অনেক আমাকে এর জন্য দিতে হয়েছে, কেউ সে কথা জানে না— কত দুঃসহ কষ্ট আমাকে স্বীকার করতে

হয়েছে। অত্যন্ত দুঃখে যাকে গড়ে তুলতে হয়েছে সে যদি এমন হয় যা আরও ঢের আছে, অর্থাৎ তার সার্থকতার মানদণ্ড যদি সাধারণের অনুগত হয়, তবে কী দরকার ছিল এমন সমূহ ক্ষতি স্বীকার করবার? বিদ্যালয় যদি একটা হাই-ইস্কুলে মাত্র পর্যবসিত হয় তবে বলতে হবে ঠকলুম। আমার সঙ্গে যাঁরা এখানে শিক্ষকতা আরম্ভ করেছিলেন, এখানকার আদর্শের মধ্যে যাঁরা ধীরে ধীরে বেড়ে উঠছিলেন, তাঁদের অনেকেই আজ পরলোকে। পরবর্তী যাঁরা এখন এসেছেন তাঁদের শিক্ষকতার আদর্শ, দূর থেকে ছাত্রদের পরিচালনা করা, এটা আমার সময় ছিল না। এরকম করে দূরত্ব রেখে অন্তঃকরণকে জাগিয়ে তোলা সম্ভব হয় না। এতে হয়তো খুব দক্ষ পরিচালনা হতে পারে কিন্তু তার চেয়ে বড়ো জিনিসের অভাব ঘটতে থাকে। এখন অনেক ছাত্র অনেক বিভাগ হয়েছে, সকলই বিচ্ছিন্ন অবস্থায় চলছে। কর্মী সমগ্র অনুষ্ঠানটিকে চিন্তার ক্ষেত্রে সেবার ক্ষেত্রে এক করে দেখতে পাচ্ছেন না— বিচ্ছেদ জন্মাচ্ছে।

আমার বক্তব্য এই যে, সকল বিভাগই যদি এক প্রাণক্রিয়ার অন্তর্গত না হয় তবে এ ভার বহন করা কঠিন। আমি যতদিন আছি ততদিন হয়তো এ বিচ্ছেদ ঠেকাতে পারি, কিন্তু আমার অবর্তমানে কার আদর্শে চলবে? আমি এই বিদ্যালয়ের জন্য অনেক দুঃখ স্বীকার করে নিয়েছি— আশা করি আমার এই উদ্‌বেগ প্রকাশ করবার অধিকার

আছে। এমন প্রতিষ্ঠান নেই যার মধ্যে কিছু নিন্দনীয় নেই, কিন্তু দরদী তা বুক দিয়ে চাপা দেয়; এমন অনুষ্ঠান নেই যার দুঃখ নেই, বন্ধু তা আনন্দের সঙ্গে বহন করে। দৃঢ় নিষ্ঠার সঙ্গে সকলে একত্র হয়ে যেন আমরা আদর্শের বিশুদ্ধি রক্ষা করি, বিদ্যালয়ের মূল উদ্দেশ্য বিস্মৃত না হই।

ক্রমে বিদ্যালয়ের মধ্যে আর-একটা আইডিয়া প্রবেশ করেছিল— সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশ্বের সঙ্গে ভারতবর্ষের যোগ। এতে নানা লাভ ক্ষতি হয়েছে, কিন্তু পেয়েছি আমি কয়েকজন বন্ধু যাঁরা এখানে ত্যাগের অর্ঘ্য এনেছেন —আমার কর্মকে, আমাকে ভালোবেসেছেন। নানা নিন্দা তাঁরা শুনেছেন। বাইরে আমরা অতি দরিদ্র, কী দেখাতে পারি— তবুও বন্ধুরূপে সাহায্য করেছেন। শ্রীনিকেতনকে যিনি রক্ষা করছেন তিনি একজন বিদেশী— কী না তিনি দিয়েছেন। এণ্ড্রুজ দরিদ্র, তবু তিনি যা পেরেছেন দিয়েছেন— আমরা তাঁকে কত আঘাত দিয়েছি, কিন্তু কখনও তাতে ক্ষুণ্ন হয়ে তিনি আমাদের ক্ষতি করেন নি। লেস্‌নি-সাহেব আমাদের পরম বন্ধু, পরম হিতৈষী। কেউ কেউ আজ পরলোকে। এই অকৃত্রিম সৌহার্দ্য সকল ক্ষতির দুঃখে সান্ত্বনা। একান্তমনে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি এই বিদেশী বন্ধুদের কাছে।

৮ পৌষ ১৩৪২

শান্তিনিকেতন

১৮

য়ুরোপে সর্বত্রই আছে বিজ্ঞানসাধনার প্রতিষ্ঠান—ব্যাপক তার আয়োজন, বিচিত্র তার প্রয়াস। আধুনিক য়ুরোপের শক্তিকেন্দ্র বিজ্ঞানে, এইজন্যে তার অনুশীলনের উদ্যোগ সহজেই সর্বজনের সমর্থন পেয়েছে। কিন্তু য়ুরোপীয় সংস্কৃতি কেবলমাত্র বিজ্ঞান নিয়ে নয়— সাহিত্য আছে, সংগীত আছে, নানাবিধ কলাবিদ্যা আছে, জনহিতকর প্রচেষ্টা আছে। এদের কেন্দ্র নানা জায়গাতেই রূপ নিয়েছে জাতির স্বাভাবিক প্রবর্তনায়।

এইসকল কেন্দ্রের প্রধান সার্থকতা কেবল তার কর্মফল নিয়ে নয়। তার চেয়ে বড়ো সিদ্ধি সাধকদের আত্মার বিকাশে। নানা প্রকারে সেই বিকাশের প্রবর্তনা ও আনুকূল্য যদি দেশের মধ্যে থাকে তবেই দেশের অন্তরাত্মা জেগে উঠতে পারে। মানুষের প্রকৃতিতে ঊর্ধ্বদেশে আছে তার নিষ্কাম কর্মের আদেশ, সেইখানে প্রতিষ্ঠিত আছে সেই বেদী যেখানে অন্য কোনো আশা না রেখে সে সত্যের কাছে বিশুদ্ধভাবে আত্মসমর্পণ করতে পারে—আর কোনো কারণে নয়, তাতে তার আত্মারই পূর্ণতা হয় ব'লে।

আমাদের দেশে এখানে সেখানে দূরে দূরে গুটিকয়েক বিশ্ববিদ্যালয় আছে, সেখানে বাঁধা নিয়মে যান্ত্রিক প্রণালীতে

ডিগ্রি বানাবার কারখানাঘর বসেছে। এই শিক্ষার সুযোগ নিয়ে ডাক্তার এঞ্জিনিয়র উকিল প্রভৃতি ব্যবসায়ীদের সংখ্যাও বেড়ে চলেছে। কিন্তু সমাজে সত্যের জন্য কর্মের জন্য নিষ্কাম আত্মনিয়োগের ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা হয় নি। প্রাচীন কালে ছিল তপোবন; সেখানে সত্যের অনুশীলন এবং আত্মার পূর্ণতা-বিকাশের জন্য সাধকেরা একত্র হয়েছেন, রাজস্বের ষষ্ঠ অংশ দিয়ে এইসকল আশ্রমকে রক্ষা করা রাজাদের কর্তব্য ছিল। সকল সভ্য দেশেই জ্ঞানের তাপস কর্মের ব্রতীদের জন্যে তপোভূমি রচিত হয়েছে।

আমাদের দেশে সাধনা বলতে সাধারণত মানুষ আধ্যাত্মিক মুক্তির সাধনা, সন্ন্যাসের সাধনা ধরে নিয়ে থাকে। আমি যে সংকল্প নিয়ে শান্তিনিকেতনে আশ্রম-স্থাপনার উদ্যোগ করেছিলুম, সাধারণ মানুষের চিত্তোৎকর্ষের সুদূর বাইরে তার লক্ষ্য ছিল না। যাকে সংস্কৃতি বলে তা বিচিত্র; তাতে মনের সংস্কার সাধন করে, আদিম খনিজ অবস্থার অনুজ্জ্বলতা থেকে তার পূর্ণ মূল্য উদ্ভাবন করে নেয়। এই সংস্কৃতির নানা শাখাপ্রশাখা; মন যেখানে সুস্থ সবল, মন সেখানে সংস্কৃতির এই নানাবিধ প্রেরণাকে আপনিই চায়।

ব্যাপকভাবে এই সংস্কৃতি-অনুশীলনের ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা ক'রে দেব, শান্তিনিকেতন-আশ্রমে এই আমার অভিপ্রায় ছিল। আমাদের দেশের বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তকের পরিধির মধ্যে জ্ঞানচর্চার যে সংকীর্ণ সীমা নির্দিষ্ট আছে, কেবলমাত্র

তাই নয়, সকলরকম কারুকার্য শিল্পকলা নৃত্যগীতবাদ্য নাট্যাভিনয় এবং পল্লীহিতসাধনের জন্যে যেসকল শিক্ষা ও চর্চার প্রয়োজন সমস্তই এই সংস্কৃতির অন্তর্গত ব'লে স্বীকার করব। চিত্তের পূর্ণবিকাশের পক্ষে এই সমস্তেরই প্রয়োজন আছে বলে আমি জানি। খাদ্যে নানা প্রকারের প্রাণীন পদার্থ আমাদের শরীরে মিলিত হয়ে আমাদের দেয় স্বাস্থ্য, দেয় বল; তেমনি যেসকল শিক্ষণীয় বিষয়ে মনের প্রাণীন পদার্থ আছে তার সবগুলিরই সমবায় হবে আমাদের আশ্রমের সাধনায়— এই কথাই আমি অনেক কাল চিন্তা করেছি।

পদ্মার বোটে ছিল আমার নিভৃত নিবাস। সেখান থেকে আশ্রমে চলে এসে আমার আসন নিলুম গুটি-পাঁচ-ছয় ছেলের মাঝখানে। কেউ না মনে করেন, তাদের উপকার করাই ছিল আমার লক্ষ্য। ক্লাস-পড়ানো কাজে উপকার করার সম্বল আমার ছিল না। বস্তুত সাধনা করার আগ্রহ আমাকে পেয়ে বসেছিল, আমার নিজেরই জন্যে। নিজেকে দিয়ে ফেলার দ্বারা নিজেকে পাওয়ার লোভ আমাকে দখল করেছিল। ছোটো ছেলেদের পড়াবার কাজে দিনের পরে দিন আমার কেটেছে, তার মধ্যে খ্যাতির প্রত্যাশা বা খ্যাতির স্বাদ পাবার উপায় ছিল না। সবচেয়ে নিম্নশ্রেণীর ইস্কুলমাস্টারি। ঐ কটি ছোটো ছেলে আমার সমস্ত সময় নিলে, অর্থ নিলে, সামর্থ্য নিলে— এইটেই আমার সার্থকতা। এই-যে আমার

সাধনার সুযোগ ঘটল, এতে করে আমি আপনাকেই পেতে লাগলুম। এই আত্মবিকাশ, এ কেবল সাধনার ফলে, বৃহৎ মানবজীবনের সংগমক্ষেত্রে। আপনাকে সরিয়ে ফেলতে পারলেই বৃহৎ মানুষের সংসর্গ পাওয়া যায়, এই সামান্য ছেলে-পড়ানোর মধ্যেও। এতে খ্যাতি নেই, স্বার্থ নেই, সেইজন্যেই এতে বৃহৎ মানুষের স্পর্শ আছে।

সকলে জানেন— আমি মানুষের কোনো চিত্তবৃত্তিকে অস্বীকার করি নি। বাল্যকাল থেকে আমার কাব্য-সাধনার মধ্যে যে আত্মপ্রকাশের প্রবল ইচ্ছা জাগ্রত ছিল, মানুষের সকল চিত্তবৃত্তির 'পরেই তার ছিল অভিমুখিতা। মানুষের কোনো চিৎশক্তির অনুশীলনকেই আমি চপলতা বা গাম্ভীর্যহানির দাগা দিই নি।

বহু বৎসর আমি নদীতীরে নৌকাবাসে সাহিত্যসাধনা করেছি, তাতে আমার নিরতিশয় শান্তি ও আনন্দ ছিল। কিন্তু মানুষ শুধু কবি নয়। বিশ্বলোকে চিত্তবৃত্তির যে বিচিত্র প্রবর্তনা আছে তাতে সাড়া দিতে হবে সকল দিক থেকে ; বলতে হবে ওঁ— আমি জেগে আছি।

এখানে এলুম যখন, তখন আমার কর্মচেষ্টায় বাইরের প্রকাশ অতি দীন ছিল। সে সম্বন্ধে এইটুকুমাত্রই বলতে পারি, সেই উপকরণবিরল অতি ছোটো ক্ষেত্রের মধ্যে আপনাকে দেওয়ার দ্বারা ও আপনাকে পাওয়ার দ্বারা যে আনন্দ তারই মধ্য দিয়ে এই আশ্রমের কাজ শুরু হয়েছে।

দিনে দিনে এই কাজের ক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছে।

আজ সে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে সর্বসাধারণের দৃষ্টির সামনে। আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছি, আমাদের দেশের দৃষ্টি প্রায়ই অনুকূল নয়। কিন্তু তাতে ক্ষতি হয় নি, তাতে কর্মের মূল্যই বেড়েছে।

যাঁরা সংকীর্ণ কর্তব্যসীমার মধ্যেও এই বিদ্যায়তনে কাজ করছেন তাঁদেরও সহযোগিতা শ্রদ্ধার সঙ্গে সকৃতজ্ঞ চিত্তে আমার স্বীকার্য।

এখানে যাঁরা এসেছেন তাঁরা একে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেছেন কি না জানি না। কিন্তু তাঁদের উদ্দেশে এই প্রতিষ্ঠানকে আমি সমর্পণ করেছি।

বহুদিন এই আশ্রমে আমরা প্রচ্ছন্ন ছিলাম। মাটির ভিতরে বীজের যে অজ্ঞাতবাস, প্রাণের স্ফুরণের জন্য তার প্রয়োজন আছে। এই অজ্ঞাতবাসের পর্ব দীর্ঘকাল চলেছিল। আজ যদি এই প্রতিষ্ঠান লোকচক্ষুর গোচর হয়ে থাকে তবে সেই প্রকাশ্য দৃষ্টিপাতের ঘাতসংঘাত ভালোমন্দ লাভক্ষতি সমস্ত স্বীকার করে নিতে হবে— কখনও পীড়িত মনে, কখনও উৎসাহের সঙ্গে।

যাঁরা উপদেষ্টা পরামর্শদাতা বা অতিথি ভাবে এখানে আসেন তাঁদের জানিয়ে রাখি— আমাদের এই বিদ্যায়তনে ব্যবসায়বুদ্ধি নেই। এখানে ক্ষণে ক্ষণে উত্তেজিত জনমতের অনুবর্তন করে জনতার মন রক্ষা করি নি, এবং সেই কারণে যদি আনুকূল্য থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকি তবে সে আমাদের সৌভাগ্য। আমরা কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে শ্রেয়কে

বরণ করবার প্রয়াস রাখি। কর্মের সাধনাকে মনুষ্যত্বসাধনার সঙ্গে এক বলে জানি। আমাদের এখানে সাধনার আসন পাতা রয়েছে। সকল স্থলেই যে সেই আসন সাধকেরা অধিকার করেছেন এমন গর্ব করি নে। কিন্তু এখানকার আবহাওয়ার মধ্যে একটি আহ্বান আছে: আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা।

আমাদের মনে বিশ্বাস হয়েছে, আমাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয় নি, যদিও ফসলের পূর্ণপরিণত রূপ আমরা দেখতে পাচ্ছি না। যাঁরা আমাদের সুদীর্ঘ এবং দুরূহ প্রয়াসের মধ্যে এমন-কিছু দেখতে পেয়েছেন যার সর্বকালীন মূল্য আছে, তাঁদের সেই অনুকূল দৃষ্টি থেকে আমরা বরলাভ করেছি। তাঁদের দৃষ্টির সেই আবিষ্কার শক্তি জাগিয়েছে আমাদের কর্মে। দূরের থেকে এসেছেন মনীষীরা অতিথিরা, ফিরেছেন বন্ধুরূপে, তাঁদের আশ্বাস ও আনন্দ সঞ্চিত হয়েছে আশ্রমের সম্পদ্‌ভাণ্ডারে।

বহুদিনের ত্যাগের দ্বারা, চেষ্টার দ্বারা এই আশ্রমকে দেশের বেদীমূলে স্থাপন করবার জন্য নৈবেদ্যসংরচনকার্য আমার আয়ুর সঙ্গে সঙ্গেই একরকম শেষ করে এনেছি। দূরের অতিথি-অভ্যাগতদের অনুমোদনের দ্বারা আমাদের কাছে এই কথা স্পষ্ট হয়েছে যে, এখানে প্রাণশক্তি রয়েছে। ফুলে ফলে বাইরের ফসলের কিছু-একটা প্রকাশ এঁরা দেখেছেন, তা ছাড়া তাঁরা এর অন্তরের ক্রিয়াকেও দেখেছেন। দূরের সেই অতিথিরা মনীষীরা আমাদের

পরম বন্ধু, কারণ তাঁদের আশ্বাস আমরা পেয়েছি। আমাদের এই আশ্রমের কর্মেতে আমি যে আপনাকে সমর্পণ করেছি তা সার্থক হবে যদি আমার এই সৃষ্টি আমি যাবার পূর্বে দেশকে সঁপে দিতে পারি। শ্রদ্ধয়া দেয়ম্ যেমন, তেমনি শ্রদ্ধয়া আদেয়ম্। যেমন শ্রদ্ধায় দিতে চাই, তেমনি শ্রদ্ধায় একে গ্রহণ করতে হবে। এই দেওয়া-নেওয়া যেদিন পূর্ণ হবে সেদিন আমার সারা জীবনের কর্ম-সাধনার এই ক্ষেত্র পূর্ণতার রূপ লাভ করবে।

৮ পৌষ ১৩৪৫

শান্তিনিকেতন

১৯

অনেক দিন পরে আজ আমি তোমাদের সম্মুখে এই মন্দিরে উপস্থিত হয়েছি। অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গেই আজ এসেছি। এ কথা জানি যে, দীর্ঘকালের অনুপস্থিতির ব্যবধানে আমার বহুকালের অনেক সংকল্পের গ্রন্থি শিথিল হয়ে এসেছে। যে কারণেই হোক, তোমাদের মন এখন আর প্রস্তুত নেই আশ্রমের সকল অনুষ্ঠানের সকল কর্তব্যকর্মের অন্তরের উদ্দেশ্যটি গ্রহণ করতে, এ কথা অস্বীকার করে লাভ নেই। এর জন্যে শুধু তোমরা নও, আমরা সকলেই দায়ী।

আজ মনে পড়ছে চল্লিশ বৎসর পূর্বের একটি দিনের কথা। বাংলার নিভৃত এক প্রান্তে আমি তখন ছিলাম পদ্মা-নদীর নির্জন তীরে। মন যখন সে দিকে তাকায়, দেখতে পায় যেন এক দূর যুগের প্রত্যূষের আভা। কখন এক উদ্‌বোধনের মন্ত্র হঠাৎ এল আমার প্রাণে। তখন কেবল-মাত্র কবিতা লিখে দিন কাটিয়েছি; অধ্যয়ন ও সাহিত্যা-লোচনার মধ্যে ডুবে ছিলাম, তারই সঙ্গে ছিল বিষয়কর্মের বিপুল বোঝা।

কেন সেই শান্তিময় পল্লীশ্রীর স্নিগ্ধ আবেষ্টন থেকে টেনে নিয়ে এল আমাকে এই রৌদ্রদগ্ধ মরুপ্রান্তরে তা বলতে পারি না।

এখানে তখন বাইরে ছিল সব দিকেই বিরলতা ও

বিজনতা, কিন্তু সব সময়েই মনের মধ্যে ছিল একটি পরিপূর্ণতার আশ্বাস। একাগ্রচিত্তে সর্বদা আকাঙ্ক্ষা করেছি, বর্তমান কালের তুচ্ছতা ইতরতা প্রগল্‌ভতা সমস্ত দূর করতে হবে। যাদের শিক্ষাদানের ভার গ্রহণ করেছি, ভারতের যুগান্তরব্যাপী সাধনার অমৃত-উৎসে তাদের পৌঁছে দিতে পারব, এই আশাই ছিল অন্তরের গভীরে।

কতদিন এই মন্দিরের সামনের চাতালে দুটি-একটি মাত্র উপাসক নিয়ে সববেত হয়েছি— অবিরত চেষ্টা ছিল সুপ্ত প্রাণকে জাগাবার। তারই সঙ্গে আরও চেষ্টা ছিল ছেলেদের মনে তাদের স্বাধীন কর্মশক্তি ও মননশক্তিকে উদ্‌বুদ্ধ করতে। কোনোদিনই খণ্ডভাবে আমি শিক্ষা দিতে চাই নি। ক্লাসের বিচ্ছিন্ন ব্যবস্থায় তাদের শিক্ষার সমগ্রতাকে আমি কখনও বিপর্যস্ত করি নি।

সেদিনের সে আয়োজন অন্ধ-অনুষ্ঠানের দ্বারা ম্লান ছিল না, অপমানিত ছিল না অভ্যাসের ক্লান্তিতে। এমন কোনো কাজ ছিল না যার সঙ্গে নিবিড় যোগ ছিল না আশ্রমের কেন্দ্রস্থলবর্তী শ্রদ্ধার একটি মূল উৎসের সঙ্গে। স্নান পান আহারে সেদিনের সমগ্র জীবনকে অভিষিক্ত করেছিল এই উৎস। শান্তিনিকেতনের আকাশ বাতাস পূর্ণ ছিল এরই চেতনায়। সেদিন কেউ একে অবজ্ঞা করে অন্যমনস্ক হতে পারত না।

আজ বার্ধক্যের ভাঁটার টানে তোমাদের জীবন থেকে দূরে পড়ে গেছি। প্রথম যে আদর্শ বহন করে এখানে

এসেছিলুম, আমার জীর্ণ শক্তির অপটুতা থেকে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে নিজের হাতে বহন করবার আনন্দিত উদ্যম কোথাও দেখতে পাচ্ছি নে। মনে হয় এ যেন বর্তমান কালেরই বৈশিষ্ট্য। সব-কিছুকে সন্দেহ করা, অপমান করা, এতেই যেন তার স্পর্ধা। তারই তো বীভৎস লক্ষণ মারীবিস্তার করে ফুটে উঠেছে দেশে বিদেশে আজকের দিনের রাষ্ট্রে সমাজে, বিদ্রূপ করছে তাকে যা মানবসভ্যতার চিরদিনের সাধনার সামগ্রী।

চল্লিশ বৎসর পূর্বে যখন এখানে প্রথম আসি তখন আশ্রমের আকাশ ছিল নির্মল। কেবল তাই নয়, তখন বিষবাষ্প ব্যাপ্ত হয় নি মানবসমাজের দিগ্‌দিগন্তে।

আজ আবার আসছি তোমাদের সামনে যেন বহুদূরের থেকে। আর-একবার মনে পড়ছে এই আশ্রমে প্রথম প্রবেশ করবার দীর্ঘ বন্ধুর পথ। বিরুদ্ধ ভাগ্যের নির্মমতা ভেদ করে সেই-যে পথযাত্রা চলেছিল সম্মুখের দিকে তার দুঃসহ দুঃখের ইতিহাস কেউ জানবে না। আজ এসেছি সেই দুঃখস্মৃতির ভিতর দিয়ে। উৎকণ্ঠিত মনে তোমাদের মধ্যে খুঁজতে এলাম তার সার্থকতা। আধুনিক যুগের শ্রদ্ধাহীন স্পর্ধা -দ্বারা এই তপস্যাকে মন থেকে প্রত্যাখ্যান কোরো না— একে স্বীকার করে নাও।

ইতিহাসে বিপর্যয় বহু ঘটেছে, সভ্যতার বহু কীর্তিমন্দির যুগে যুগে বিধ্বস্ত হয়েছে, তবু মানুষের শক্তি আজও সম্পূর্ণ লোপ পায় নি। সেই ভরসার 'পরে ভর করে মজ্জমান

তরী -উদ্ধারচেষ্টা করতে হবে, নতুন হাওয়ার পালে সে আবার যাত্রা শুরু করবে। কালের স্রোত বর্তমান যুগের নবীন কর্ণধারদেরকেও ভিতরে ভিতরে যে এগিয়ে নিয়ে চলেছে, তা সব সময় তাঁদের অনুভূতিতে পৌঁছয় না। একদিন যখন প্রগল্‌ভ তর্কের এবং বিদ্রূপমুখর অট্টহাস্যের ভিতর দিয়ে তাঁদেরও বয়সের অঙ্ক বেড়ে যাবে, তখন সংশয়শুষ্ক বন্ধ্যা বুদ্ধির অভিমান প্রাণে শান্তি দেবে না। অমৃত-উৎসের অন্বেষণ তখন আরম্ভ হবে জীবনে।

সেই আশা-পথের পথিক আমরা, নূতন প্রভাতের উদ্‌বোধনমন্ত্র শ্রদ্ধার সঙ্গে গান করবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি, যে শ্রদ্ধায় আছে অপরাজেয় বীর্য, নাস্তিবাদের অন্ধকারে যার দৃষ্টি পরাহত হবে না, যে ঘোষণা করবে—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

৮ শ্রাবণ ১৩৪৭
শান্তিনিকেতন

পরিশিষ্ট

এই আশ্রমের গুরুর অনুজ্ঞায় ও আপনাদের অনুমতিতে আমাকে যে সভাপতির ভার দেওয়া হল তাহা আমি শিরোধার্য করে নিচ্ছি। আমি এ ভারের সম্পূর্ণ অযোগ্য। কিন্তু আজকের এই প্রতিষ্ঠান বিপুল ও বহুযুগব্যাপী। তাই ব্যক্তিগত বিনয় পরিহার করে আমি এই অনুষ্ঠানে ব্রতী হলাম। বহু বৎসর ধরে এই আশ্রমে একটা শিক্ষার কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। এই ধরনের এডুকেশনাল এক্‌স্‌পেরিমেন্‌ট্‌ দেশে খুব বিরল। এই দেশ তো আশ্রম-সংঘ-বিহারের দেশ। কোথাও কোথাও 'গুরুকুল'এর মতো দু-একটা এমনি বিদ্যালয় থাকলেও, এটি এক নূতন ভাবে অনুপ্রাণিত। এর স্থান আর কিছুতে পূর্ণ হতে পারে না। এখানে খোলা আকাশের নীচে প্রকৃতির ক্রোড়ে মেঘরৌদ্রবৃষ্টিবাতাসে বালকবালিকারা লালিতপালিত হচ্ছে। এখানে শুধু বহিরঙ্গ-প্রকৃতির আবির্ভাব নয়, কলাসৃষ্টির দ্বারা অন্তরঙ্গ-প্রকৃতিও পারিপার্শ্বিক অবস্থায় জেগে উঠেছে। এখানকার বালক-বালিকারা এক-পরিবার-ভুক্ত হয়ে আচার্যদের মধ্যে রয়েছে। একজন বিশ্বপ্রাণ পার্সনালিটি এখানে সর্বদাই এর মধ্যে জাগ্রত রয়েছেন। এমনিভাবে এই বিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। আজ সেই ভিত্তির প্রসার ও পূর্ণাঙ্গতা সাধন হতে চলল। আজ এখানে বিশ্বভারতীর অভ্যুদয়ের

দিন। 'বিশ্বভারতী'র কোষানুযায়িক অর্থের দ্বারা আমরা বুঝি যে, যে 'ভারতী' এতদিন অলক্ষিত হয়ে কাজ করছিলেন আজ তিনি প্রকট হলেন। কিন্তু এর মধ্যে আর-একটি ধ্বনিগত অর্থও আছে— বিশ্ব ভারতের কাছে এসে পৌঁছবে, সেই বিশ্বকে ভারতীয় করে নিয়ে আমাদের রক্তরাগে অনুরঞ্জিত ক'রে ভারতের মহাপ্রাণে অনুপ্রাণিত ক'রে আবার সেই প্রাণকে বিশ্বের কাছে উপস্থিত করব। সেই ভাবেই বিশ্বভারতীর নামের সার্থকতা আছে।

একটা কথা আমাদের স্মরণ রাখতে হবে— ভারতের মহাপ্রাণ কোন্‌টা। যে মহাপ্রাণ লুপ্তপ্রায় হয়ে এসেছে তাকে ধরতে গিয়ে আমরা যদি বিশ্বের সঙ্গে কারবার স্থাপন ও আদানপ্রদান না করি তবে আমাদের আত্মপরিচয় হবে না। Each can realize himself only by helping others as a whole to realize themselves এ যেমন সত্য, এর converse অর্থাৎ others can realize themselves by helping each individual to realize himselfও তেমনি সত্য। অপরে আমার লক্ষ্যের পথে, যাবার পথে যেমন মধ্যবর্তী, তেমনি আমিও তার মধ্যবর্তী; কারণ আমাদের উভয়কে যেখানে ব্রহ্ম বেষ্টন করে আছেন সেখানে আমরা এক, একটি মহা ঐক্যে অন্তরঙ্গ হয়ে আছি। এ ভাবে দেখতে গেলে বিশ্বভারতীতে ভারতের প্রাণ কী তার পরিচয় পেতে হবে,

তাতে করে জগতের যে পরিচয় ঘটবে তার রূপে আত্মাকে প্রতিফলিত দেখতে পাব।

আমি আজ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। আজ জগৎ জুড়ে একটি সমস্যা রয়েছে। সর্বত্রই একটা বিদ্রোহের ভাব দেখা যাচ্ছে— সে বিদ্রোহ প্রাচীন সভ্যতা, সমাজতন্ত্র, বিদ্যাবুদ্ধি, অনুষ্ঠান, সকলের বিরুদ্ধে। আমাদের আশ্রম দেবালয় প্রভৃতি যা-কিছু হয়েছিল তা যেন সব ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছে। বিদ্রোহের অনল জ্বলছে, তা অর্ডার-প্রগ্রেস'কে মানে না, রিফর্ম্ চায় না, কিছুই চায় না। যে মহাযুদ্ধ হয়ে গেল এই বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে তার চেয়ে বড়ো যুদ্ধ চলে আসছে, গত মহাযুদ্ধ তারই একটা প্রকাশ মাত্র। এই সমস্যার পূরণ কেমন করে হবে, শান্তি কোথায় পাওয়া যাবে, সকল জাতিই এর উত্তর দেবার অধিকারী। এই সমস্যায় ভারতের কী বলবার আছে, দেবার আছে?

আমরা এত কালের ধ্যানধারণা থেকে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি তার দ্বারা এই সমস্যা পূরণ করবার কিছু আছে কি না। য়ুরোপে এ সম্বন্ধে যে চেষ্টা হচ্ছে সেটা পোলিটিকাল অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশনের দিক দিয়ে হয়েছে। সেখানে রাজনৈতিক ভিত্তির উপর ট্রীটি, কন্‌ভেন্‌শন, প্যাক্ট্-এর ভিতর দিয়ে শান্তিস্থাপনের চেষ্টা হচ্ছে। এ হবে এবং হবার দরকারও আছে। দেখছি সেখানে মাল্‌টিপ্‌ল্ অ্যালায়েন্‌স্ হয়েও হল না, বিরোধ ঘটল। আর্‌বিট্রেশন কোর্ট্ এবং হেগ-কন্‌ফারেন্সে হল না, শেষে

লীগ অব নেশনস্‌-এ গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। তার অবলম্বন হচ্ছে limitation of armaments। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে, এ ছাড়া আরও অন্য দিকে চেষ্টা করতে হবে; কেবল রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নয়, সামাজিক দিকে এর চেষ্টা হওয়া দরকার। Universal simultaneous disarmament of all nations -এর জন্য নূতন হিউম্যানিজমের রিলিজ্যস মুভ্‌মেন্ট্‌ হওয়া উচিত। তার ফলস্বরূপ যে মেশিনারি হবে তা পার্লামেন্ট্‌ বা ক্যাবিনেটের ডিপ্লোম্যাসির অধীনে থাকবে না। পার্লামেন্ট্‌সমূহের জয়েন্ট্‌ সিটিং তো হবেই, সেইসঙ্গে বিভিন্ন peopleএরও কন্‌ফারেন্স্‌ হলে তবেই শান্তির প্রতিষ্ঠা হতে পারে। কিন্তু একটা জিনিস আবশ্যক হবে— massএর life, massএর religion। বর্তমান কালে কেবলমাত্র individual salvation-এ চলবে না; সর্বমুক্তিতেই এখন মুক্তি, না হলে মুক্তি নেই। ধর্মের এই mass life -এর দিকটা সমাজে স্থাপন করতে হবে।

ভারতের এ সম্বন্ধে কী বাণী হবে। ভারতও শান্তির অনুধাবন করেছে, চীনদেশও করেছে। চীনে সামাজিক দিক দিয়ে তার চেষ্টা হয়েছে। যদি social fellowship of man with man হয়, তবেই international peace হবে, নয়তো হবে না। কন্‌ফ্যুসিয়সের গোড়ার কথাই এই যে, সমাজ একটা পরিবার, শান্তি সামাজিক ফেলোশিপের উপর স্থাপিত; সমাজে যদি শান্তি হয় তবেই বাইরে

শান্তি হতে পারে। ভারতবর্ষে এর আর-একটা ভিত্তি দেওয়া হয়েছে, তা হচ্ছে অহিংসা মৈত্রী শান্তি। প্রত্যেক individualএ বিশ্বরূপদর্শন এবং তারই ভিতর ব্রহ্মের ঐক্যকে অনুভব করা ; এই ভাবের মধ্যে যে peace আছে ভারতবর্ষ তাকেই চেয়েছে। ব্রহ্মের ভিত্তিতে আত্মাকে স্থাপন করে যে peace compact হবে তাতেই শান্তি আনবে। এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় চীনদেশের সোশ্যাল ফেলোশিপ এবং ভারতের আত্মার শান্তি এই দুইই চাই, নতুবা লীগ অব নেশন্‌স্‌-এ কিছু হবে না। গ্রেট ওঅরের থেকেও বিশালতর যে দ্বন্দ্ব জগৎ জুড়ে চলছে, তার জন্য ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে বিশ্বভারতীকে বাণী দিতে হবে।

ভারতবর্ষ দেখেছে যে, রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে যে state আছে তা কিছু নয়। সে বলেছে যে, নেশনের বাইরেও মহা সত্য আছে, সনাতন ধর্মেই তার স্বাজাত্য রয়েছে। যেখানে আত্মার বিকাশ ও ব্রহ্মের আবির্ভাব সেখানেই তাহার দেশ। ভারতবর্ষ ধর্মের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে এই extra-territorial nationalityতে বিশ্বাস করেছে। এই ভাবের অনুসরণ করে লীগ অব নেশন্‌সের ন্যাশনালিটির ধারণাকে সংশোধিত করতে হবে। তেমনি আত্মার দিক দিয়ে extra-territorial sovereigntyর ভাবকে স্থান দিতে হবে। এমনিভাবে Federation of the World স্থাপিত হতে পারে, এখনকার সময়ের উপযোগী করে লীগ অব নেশন্‌সে এই extra-territorial

nationalityর কথা উত্থাপন করা যেতে পারে। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় দিক দিয়ে এই বাণী দেবার আছে। আমরা দেখতে পাই যে, বৌদ্ধ প্রচারকগণ এই ভাবটি প্রচার করেছিলেন যে, প্রত্যেক রাজার code এমন হওয়া উচিত যা শুধু নিজের জাতির নয়, অপর সব জাতির সমানভাবে হিতসাধন করতে পারবে। ভারতের ইতিহাসে এই বিধিটি সর্বদা রক্ষিত হয়েছে, তার রাজারা জয়ে পরাজয়ে, রাজচক্রবর্তী হয়েও, এমনি করে আন্তর্জাতিক সম্বন্ধকে স্বীকার করেছেন।

সামাজিক জীবন সম্বন্ধে ভারতবর্ষের মেসেজ কী। আমাদের এখানে গ্রুপ ও কম্যুনিটির স্থান খুব বেশি। এরা intermediary body between state and individual। রোম প্রভৃতি দেশে রাষ্ট্রব্যবস্থার ফলে স্টেট ও ইন্‌ডিভিজুয়ালে বিরোধ বেধেছিল ; শেষে ইন্‌ডিভিজুয়ালিজ্‌মের পরিণতি হল অ্যানার্কিতে, এবং স্টেট—মিলিটারি সোশ্যালিজ্‌মে গিয়ে দাঁড়ালো। আমাদের দেশের ইতিহাসে গ্রামে বর্ণাশ্রমে এবং ধর্মসংঘের ভিতরে কম্যুনিটির জীবনকেই দেখতে পাই। বর্ণাশ্রমে যেমন প্রতি ব্যক্তির কিছু প্রাপ্য ছিল, তেমনি তার কিছু দেয়ও ছিল, তাকে কতকগুলি নির্ধারিত কর্তব্য পালন করতে হত। Community in the individual যেমন আছে তেমনি the individual in the communityও আছে। প্রত্যেকের ব্যক্তিজীবনে গ্রুপ পার্সনালিটি এবং ইন্‌ডিভিজুয়াল

পার্সনালিটি জাগ্রত আছে, এই উভয়েরই সমান প্রয়োজন আছে। গ্রুপ পার্সনালিটির ভিতর ইন্‌ডিভিজুয়ালের স্বাধিকারকে স্থান দেওয়া দরকার। আমাদের দেশে ত্রুটি রয়ে গেছে যে, আমাদের ইন্‌ডিভিজুয়াল পার্সনালিটির বিকাশ হয় নি, co-ordination of power in the stateও হয় নি। আমরা ইন্‌ডিভিজুয়াল পার্সনালিটির দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি, ব্যূহবদ্ধ শত্রুর হাতে আমাদের লাঞ্ছিত হতে হয়েছে।

আজকাল য়ুরোপে group principleএর দরকার হচ্ছে। সেখানে political organization, economic organization, এসবই group গঠন করার দিকে যাচ্ছে। আমাদেরও এই পথে সমস্যাপূরণ করবার আছে। আমাদের যেমন য়ুরোপের কাছ থেকে স্টেটের centralization ও organization নেবার আছে তেমনি য়ুরোপকেও group principle দেবার আছে। আমরা সে দেশ থেকে economic organizationকে গ্রহণ করে আমাদের village communityকে গড়ে তুলব। কৃষিই আমাদের জীবনযাত্রার প্রধান অবলম্বন, সুতরাং ruralizationএর দিকে আমাদের চেষ্টাকে নিয়োগ করতে হবে। অবশ্য আমি সেজন্য বলছি না যে, town lifeকে develop করতে হবে না ; তারও প্রয়োজন আছে। কিন্তু আমাদের ভূমির সঙ্গে প্রাণের যোগ-সাধন করতে হবে। ভূমির সঙ্গে ownershipএর সম্বন্ধ হলে তবে স্বাধীনতা থাকতে পারে।

কারখানার জীবনও দরকার আছে, কিন্তু ভূমি ও বাস্তুর সঙ্গে individual ownershipএর যোগকে ছেড়ে না দিয়ে large-scale production আনতে হবে। বড়ো আকারে energyকে আনতে হবে, কিন্তু দেখতে হবে—কলের energy মানুষের আত্মাকে পীড়িত অভিভূত না করে, যেন জড় না করে দেয়। সমবায়প্রণালীর দ্বারা হাতের কলকেও দেশে স্থান দিতে হবে। এমনিভাবে economic organizationএ ভারতকে আত্মপরিচয় দিতে হবে। আমাদের স্ট্যাণ্ডার্ড্ অব লাইফ এত নিম্ন স্তরে আছে যে, আমরা decadent হয়ে মরতে বসেছি। যে প্রণালীতে efficient organizationএর নির্দেশ করলাম তাকে না ছেড়ে বিজ্ঞানকে আমাদের প্রয়োজনসাধনে লাগাতে হবে। আমাদের বিশ্বভারতীতে তাই, রাষ্ট্রনীতি সমাজধর্ম ও অর্থনীতির যে যে ইন্স্টিট্যুশন পৃথিবীতে আছে, সে-সবকেই স্টডি করতে হবে, এবং আমাদের দৈন্য কেন ও কোথায় তা বুঝে নিয়ে আমাদের অভাব পূরণ করতে হবে। কিন্তু এতে করে নিজের প্রাণকে ও সৃজনী-শক্তিকে যেন বাইরের চাপে নষ্ট না করি। যা-কিছু গ্রহণ করব তাকে ভারতের ছাঁচে ঢেলে নিতে হবে। আমাদের সৃজনীশক্তির দ্বারা তারা coined into our flesh and blood হয়ে যাওয়া চাই।

ভিন্ন ভিন্ন জাতির স্কীম অব লাইফ আছে কিন্তু তাদের ইতিহাস ও ভূপরিচয়ের মধ্যেও একটি বৃহৎ ঐক্য

আছে, এই বিভিন্নতার মধ্যেও এক জায়গায় unity of human race আছে। তাদের সেই ইতিহাস ও ভূগোলের বিভিন্ন environmentএর জন্য যে life values সৃষ্ট হয়েছে, পরস্পরের যোগাযোগের দ্বারা তাদের বিস্তৃতি হওয়া প্রয়োজন। এই লাইফ-স্কীমগুলির আদান-প্রদানে বিশ্বে তাদের বৃহৎ লীলাক্ষেত্র তৈরি হবে।

আমাদের জাতীয় চরিত্রে কী কী অভাব আছে, কী কী আমাদের বাইরে থেকে আহরণ করতে হবে? আমাদের মূল ত্রুটি হচ্ছে, আমরা বড়ো একপেশে—ইমোশনাল। আমাদের ভিতরে will ও intellectএর মধ্যে, সব্জেক্টিভিটি ও অব্জেক্টিভিটির মধ্যে চির-বিচ্ছেদ ঘটেছে। আমরা হয় খুব সব্জেক্টিভ্, নয়তো খুব য়ুনিভার্সাল। অনেক সময়েই আমরা য়ুনিভার্সা-লিজ্মের বা সাম্যের চরম সীমায় চলে যাই, কিন্তু differentiationএ যাই না। আমাদের অব্জেক্টিভিটির পূর্ণ বিকাশ হওয়া দরকার। প্রকৃতিপর্যবেক্ষণ ও অব্জার্ভেশনের ভিতর দিয়ে মনের সত্যানুবর্তিতাকে ও শৃঙ্খলাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আমাদের intellectএর characterএর অভাব আছে, সুতরাং আমাদের intellectual honestyর প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। তা হলেই দেখব যে, কর্তব্যবোধ জাগ্রত হয়েছে। অন্য দিকে আমাদের moral ও personal responsibilityর বোধকে জাগাতে হবে, Law, Justice ও Equalityর

যা লুপ্ত হয়ে গেছে তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে— এসকল বিষয়ে আমাদের শিক্ষা আহরণ করতে হবে। আমাদের মধ্যে বিশ্বকে না পেলে আমরা নিজেকে পাব না। তাই বিশ্বরূপকে প্রতিষ্ঠিত করে আমরা আত্মপরিচয় লাভ করব এবং আমাদের বাণী বিশ্বকে দেব।

এ দেশে অনেক বিশ্ববিদ্যালয় অনেক প্রতিষ্ঠান আছে, কিন্তু সেখান থেকে cast iron ও rigid standardized product তৈরি হচ্ছে। শান্তিনিকেতনে naturalnessএর স্থান হয়েছে, আশা করি বিশ্বভারতীতে সেই spontaneityর বিকাশের দিকে দৃষ্টি থাকবে। য়ুনিভার্সিটিকে জাতীয় প্রতিষ্ঠান বলা যেতে পারে। এশিয়ার genius য়ুনিভার্সাল হিউম্যানিজ্‌মের দিকে, অতএব ভারতের এবং এশিয়ার interestএ এরূপ একটি য়ুনিভার্সিটির প্রয়োজন আছে। পূর্বে যে সংঘ ও বিহারের দ্বারা ভারতের সার্থকতা-সাধন হয়েছিল, তাদেরই এ যুগের উপযোগী ক'রে, সেই পুরাতন আরণ্যককে বিশ্বভারতী রূপে এখানে পত্তন করা হয়েছে।

৮ পৌষ ১৩২৮ শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ শীল

শান্তিনিকেতন

বিশ্বভারতী পরিষদ্-সভার প্রতিষ্ঠা-উৎসবে

সভাপতির অভিভাষণ

গ্রন্থপরিচয়

১৩০৮ সালের ৭ পৌষ শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপিত হয়; ১৩২৮ সালের ৮ পৌষ বিশ্বভারতী পরিষদ্‌ সভায় প্রতিষ্ঠা।

আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত হইবার বহু পূর্ব হইতেই শান্তিনিকেতনে 'সর্বমানবের যোগ-সাধনের সেতু' -রচনার কল্পনা রবীন্দ্রনাথের মনকে ক্রমশ অধিকার করিতে থাকে; শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক ও ছাত্রদিগকে লিখিত কোনো কোনো পত্রে তাহার আভাস পাওয়া যায়।

'সিকাগো। ৩ মার্চ [১৯১৩]।... এখানে মানুষের শক্তির মূর্তি যে পরিমাণে দেখি পূর্ণতার মূর্তি সে পরিমাণে দেখতে পাই নে।... মানুষের শক্তির যতদূর বাড় হবার তা হয়েছে, এখন সময় হয়েছে যখন যোগের জন্যে সাধনা করতে হবে। আমাদের বিদ্যালয়ে আমরা কি সেই যুগসাধনার প্রবর্তন করতে পারব না? মনুষ্যত্বকে বিশ্বের সঙ্গে যোগযুক্ত করে তার আদর্শ কি আমরা পৃথিবীর সামনে ধরব না?... মানুষকে তার সফলতার সুরটি ধরিয়ে দেবার সময় এসেছে। আমাদের শান্তিনিকেতনের পাখিদের কণ্ঠে

সেই সুরটি কি ভোরের আলোয় ফুটে উঠবে না?'…
—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বৈশাখ ১৩২০। প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ
১৩২০, কষ্টিপাথর

'লস এঞ্জেলস্। ১১ অক্টোবর ১৯১৬। … তার পরে এও আমার মনে আছে যে, শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়কে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের যোগের সূত্র করে তুলতে হবে— ঐখানে সার্বজাতিক মনুষ্যত্বচর্চার কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে— স্বাজাতিক সংকীর্ণতার যুগ শেষ হয়ে আসছে— ভবিষ্যতের জন্য যে বিশ্বজাতিক মহামিলনযজ্ঞের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে তার প্রথম আয়োজন ঐ বোলপুরের প্রান্তরেই হবে। ঐ জায়গাটিকে সমস্ত জাতিগত ভূগোলবৃত্তান্তের অতীত করে তুলব এই আমার মনে আছে— সর্বমানবের প্রথম জয়ধ্বজা ঐখানে রোপণ হবে।'
—চিঠিপত্র ২

'…বিশ্বভারতীর উদ্যোগ। গত [১৩২৫] ৮ই পৌষে তাহার সূচনা হয় এবং গত বৎসরই চিত্র, সংগীত প্রভৃতি কলা এবং সংস্কৃত, পালি, ইংরেজি প্রভৃতি সাহিত্যের অধ্যাপনার কাজ আরম্ভ হয়।' 'গত বৎসর [১৩২৫] ৮ই পৌষে আশ্রমের বার্ষিক উৎসবের দিনে বিশ্বভারতী স্থাপিত হয়, এবং বর্তমান বৎসরে [১৩২৬] ১৮ই আষাঢ় ইহার নিয়মানুযায়ী

কার্যের আরম্ভ হয়।' 'বিগত ২৩ ডিসেম্বর [১৯২১] ৮ পৌষ [১৩২৮]··· বিশ্বভারতীর সাংবৎসরিক··· সভায় বিশ্বভারতী পরিষদ্ গঠিত হয় এবং বিশ্ব-ভারতীর জন্য যে সংস্থিতি (constitution) প্রণীত হইয়াছে তাহা গৃহীত হয়' —এই তারিখই বর্তমানে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাদিবস বলিয়া স্বীকৃত; এই দিন 'সর্বসাধারণের হাতে তাকে সমর্পণ' করা হয়।

বিশ্বভারতীর সূচনা হইবার পর, ১৯১৯ খৃস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে নিমন্ত্রিত হইয়া The Centre of Indian Culture প্রভৃতি প্রবন্ধে শিক্ষার সম্বন্ধে তাহার আদর্শ ব্যাখ্যা করেন। 'আমাদের দেশে শিক্ষার আদর্শ কী হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে আমার প্রবন্ধ আমি কলিকাতায় এবং অন্য অনেক শহরে পাঠ করিয়াছি। বিষয়টি এত বড়ো যে আমাদের এই ছোটো পত্রপুটে তাহা ধরিবে না। সংক্ষেপে তাহার মর্মটুকু এখানে বলি।' এই 'মর্ম' শান্তিনিকেতন পত্রের ১৩২৬ বৈশাখ সংখ্যায় 'বিশ্বভারতী' নামে প্রকাশিত হয়; উহাই বর্তমান গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ।

'শিক্ষাকে কেমন করিয়া সত্য এবং প্রাণের জিনিস করা যায়' এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নানা

চিন্তা এই সময় শান্তিনিকেতন পত্রে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতে থাকে— বিশ্বভারতী প্রসঙ্গে ইহার কোনো কোনো রচনা অংশতঃ উদ্ধৃত হইল—

'আমাদের দেশে বর্তমানে দুই রকমের ভীরুতা দেখা যায়। কাহারও ভীরুতা দেশী প্রকৃতিকে রক্ষা করিতে; কাহারও ভীরুতা য়ুরোপীয় শিক্ষা গ্রহণ করিতে। যাঁহারা এই দুই ভীরুতাকেই অতিক্রম করিয়াছেন তাঁহারাই ভারতবর্ষকে বাঁচাইবেন। মৈসুরের রাজাসন এই দুই ভয়কেই ছাড়াইয়া উঠিয়াছে।

'এইজন্যই যখন মৈসুরের নূতন বিশ্ববিদ্যালয় দেখিলাম সেটা এতই বেসুরা বোধ হইল। ইহার মধ্যে আমাদের আপন কিছুই নাই, ইহা একেবারেই নকল। ইহাতেই বুঝিলাম, বিদ্যা সম্বন্ধে ভারতবর্ষ আপন সাহস একেবারেই হারাইয়া ফেলিয়াছে। যে বিদ্যালয়কে আমরা বিশ্ববিদ্যালয় বলিয়া থাকি তাহার মধ্যে ভারতবর্ষকে বড়ো জায়গা দিতে আমরা কুণ্ঠিত। যেন বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে য়ুরোপের বাহিরে বিশ্বই নাই। যেন বিশ্বের মধ্যে ভারতবর্ষ বলিয়া পদার্থের অস্তিত্বই মেলে না, অথবা অণুবীক্ষণের সাহায্যে ধূলিকণার মধ্যে তাহাকে খুঁটিয়া পাওয়া যায়; সেইজন্য মৈসুরের মতো স্থানেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ইটকাঠ, তাহার চৌকিটেবিল, তাহার পুঁথিপত্র,

তাহার বিষয় ও আশয়ের মধ্যে ভারতবর্ষ নিতান্তই সংকুচিত ও প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। বিদ্যাগারের মধ্যে ভারতবর্ষের প্রতি এই আস্থার অভাব, এই সম্মানের অভাব যে কিরূপ গভীরভাবে আমাদের মনকে আত্ম-অবিশ্বাসের মধ্যে চিরদিনের মতো মজ্জিত করিয়া দিতেছে সে কথা ভালো করিয়া বুঝিয়া দেখিবার পর্যন্ত শক্তি আমরা হারাইয়াছি। মৈসুরে আমাদের ভরসার বিষয় অনেক দেখিয়াছি তাই এখনও এই আশা মনে রাখিলাম যে… একদিন মৈসুরের বিশ্ববিদ্যালয়ে পশ্চিমের বাণীর সঙ্গে আমাদের ভারতীর একাসনে মিলন ঘটিবে— কিন্তু সেই আসনটি হইবে ভারতীরই আসন।'

—মৈসুরের কথা, শান্তিনিকেতন, বৈশাখ ১৩২৬

'ভারতবর্ষের নানা স্থানেই নূতন নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা চলিতেছে। ইহাতেই বুঝা যায় শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের মনে একটা অসন্তোষ জন্মিয়াছে।…

'বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীটাই যে আমাদের ব্যর্থতার কারণ, অভ্যাসগত অন্ধ মমতার মোহে সেটা আমরা কিছুতেই মনে ভাবিতে পারি না। ঘুরিয়া ফিরিয়া নূতন বিশ্ববিদ্যালয় গড়িবার বেলাতেও প্রণালী বদল করিবার কথা মনেই আসে না, তাই নূতনের ঢালাই করিতেছি সেই পুরাতনের ছাঁচে। নূতনের জন্য

ইচ্ছা খুবই হইতেছে, অথচ ভরসা কিছুই হইতেছে না। কেননা ঐটেই যে রোগ, এতদিনের শিক্ষা-বোঝার চাপে সেই ভরসাটাই যে সমূলে মরিয়াছে।'

—অসন্তোষের কারণ, শান্তিনিকেতন, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬

'আমাদের দেশে বিদ্যাসমবায়ের একটি বড়ো ক্ষেত্র চাই, যেখানে বিদ্যার আদান প্রদান ও তুলনা হইবে, যেখানে ভারতীয় বিদ্যাকে মানবের সকল বিদ্যার ক্রমবিকাশের মধ্যে রাখিয়া বিচার করিতে হইবে।

'তাহা করিতে গেলে ভারতীয় বিদ্যাকে তাহার সমস্ত শাখা-উপশাখার যোগে সমগ্র করিয়া জানা চাই। ভারতীয় বিদ্যার সমগ্রতার জ্ঞানটিকে মনের মধ্যে পাইলে তাহার সঙ্গে বিশ্বের সমস্ত বিদ্যার সম্বন্ধনির্ণয় স্বাভাবিক প্রণালীতে হইতে পারে। কাছের জিনিসের বোধ দূরের জিনিসের বোধের সহজ ভিত্তি।

'বিদ্যার নদী আমাদের দেশে বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, জৈন, প্রধানত এই চারি শাখায় প্রবাহিত। ভারতচিত্তগঙ্গোত্রীতে ইহার উদ্ভব। কিন্তু, দেশে যে নদী চলিতেছে, কেবল সেই দেশের জলেই সেই নদী পুষ্ট না হইতেও পারে। ভারতের গঙ্গার সঙ্গে তিব্বতের ব্রহ্মপুত্র মিলিয়াছে। ভারতের বিদ্যার স্রোতেও সেইরূপ মিলন ঘটিয়াছে। বাহির হইতে মুসলমান যে জ্ঞান ও ভাবের ধারা এখানে বহন করিয়া আনিয়াছে সেই ধারা ভারতের চিত্তকে স্তরে

স্তরে অভিষিক্ত করিয়াছে, তাহা আমাদের ভাষায় আচারে শিল্পে সাহিত্যে সংগীতে নানা আকারে প্রকাশমান। অবশেষে সম্প্রতি য়ুরোপীয় বিদ্যার বন্যা সকল বাঁধ ভাঙিয়া দেশকে প্লাবিত করিয়াছে; তাহাকে হাসিয়া উড়াইতেও পারি না, কাঁদিয়া ঠেকানোও সম্ভবপর নহে।

'অতএব, আমাদের বিদ্যায়তনে বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান ও পার্সি বিদ্যার সমবেত চর্চায় আনুষঙ্গিকভাবে য়ুরোপীয় বিদ্যাকে স্থান দিতে হইবে।

'সমস্ত পৃথিবীকে বাদ দিয়া যাহারা ভারতকে একান্ত করিয়া দেখে তাহারা ভারতকে সত্য করিয়া দেখে না। তেমনি যাহারা ভারতের কেবল এক অংশকেই ভারতের সমগ্রতা হইতে খণ্ডিত করিয়া দেখে তাহারাও ভারতচিত্তকে নিজের চিত্তের মধ্যে উপলব্ধি করিতে পারে না।···

'ভারতে সেই চিত্তের ঐক্যকে পোলিটিকাল ঐক্যের চেয়ে বড়ো বলিয়া জানিতে হইবে; কারণ, এই ঐক্যে সমস্ত পৃথিবীকে ভারতবর্ষ আপন অঙ্গনে আহ্বান করিতে পারে। অথচ, দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের বর্তমান শিক্ষা এমন যে, সেই শিক্ষার গুণেই ভারতীয় চিত্তকে আমরা তাহার স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতেছি না।

'ভারতের হিন্দু বৌদ্ধ জৈন মুসলমান শিখ পার্সি

খৃস্টানকে এক বিরাট চিত্তক্ষেত্রে সত্যসাধনার যজ্ঞে সমবেত করাই ভারতীয় বিদ্যায়তনের প্রধান কাজ— ছাত্রদিগকে কেবল ইংরেজি মুখস্থ করানো, অঙ্ক কষানো, সায়ান্স্ শেখানো নহে।'…

—বিদ্যাসমবায়[১], শান্তিনিকেতন, আশ্বিন-কার্তিক ১৩২৬

'গত [১৩২৬] ১৮ই আষাঢ় আশ্রমের অধিপতি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সভাপতিত্বে প্রারম্ভোৎসব সমাধা করিয়া বিশ্বভারতীর কার্য আরম্ভ করা হইয়াছে।' এই কার্যারম্ভের দিনে রবীন্দ্রনাথ যে বক্তৃতা দেন তাহার সারসংকলন বর্তমান গ্রন্থের দ্বিতীয় প্রবন্ধরূপে মুদ্রিত হইল ; প্রথমে ইহা শান্তিনিকেতন পত্রের ১৩২৬ শ্রাবণ সংখ্যায় 'বিশ্বভারতী' নামে প্রকাশিত হইয়াছিল।

'বিগত ২৩ ডিসেম্বর [১৯২১] ৮ পৌষ [১৩২৮] বোলপুরে শান্তিনিকেতন-আশ্রমের আম্রকুঞ্জে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নূতন শিক্ষার কেন্দ্র বিশ্বভারতীর সাংবৎসরিক সভার অধিবেশন হয়।

---

১ 'অসন্তোষের কারণ' ও 'বিদ্যাসমবায়' প্রবন্ধ দুইটি শিক্ষা গ্রন্থের প্রচলিত সংস্করণে সম্পূর্ণ মুদ্রিত আছে। উক্ত গ্রন্থে 'বিদ্যার যাচাই' (শান্তিনিকেতন, আষাঢ় ১৩২৬) প্রবন্ধটিও দ্রষ্টব্য।

সেই সভায় বিশ্বভারতী পরিষদ্ গঠিত হয় এবং বিশ্বভারতীর জন্য যে সংস্থিতি (constitution) প্রণীত হইয়াছে তাহা গৃহীত হয়। ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আচার্য সিল্‌ভ্যাঁ লেভি, ম্যাডাম লেভি, রাজগুরু ধর্মাধার মহাস্থবির, ডাক্তার মিস্ ক্রাম্‌রিশ্, শ্রীযুক্ত উইলিয়াম পিয়ার্সন, শ্রীযুক্তা স্নেহলতা সেন, শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী, শ্রীমতী প্রতিমা দেবী, শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায়, স্যার নীলরতন সরকার, দিল্লির সেণ্ট স্টিফেন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত এস্ কে রুদ্র, শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র ঠাকুর, শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, ডাক্তার শিশিরকুমার মৈত্র -প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।... সর্বপ্রথমে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়কে সভাপতিত্বে বরণ করিবার প্রস্তাব করেন... ।'—

'আমি ইচ্ছা করি আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় কিছু বলুন। আমাদের কী কর্তব্য, এই বিশ্বভারতীর সঙ্গে তাঁর চিত্তের যোগ কোথায়, তা আমরা শুনতে চাই। আমি এই সুযোগ গ্রহণ করে আপনাদের অনুমতিক্রমে তাঁকে সভাপতির পদে বরণ করলুম।'

এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ যে বক্তৃতা করেন তাহা

এই গ্রন্থের তৃতীয় প্রবন্ধ রূপে মুদ্রিত হইল— পূর্বে তাহা শান্তিনিকেতন পত্রের ১৩২৮ মাঘ সংখ্যায় 'বিশ্বভারতী পরিষদ্‌-সভার প্রতিষ্ঠা' নামে প্রকাশিত হইয়াছিল।

সভাপতিরূপে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের অভিভাষণের 'সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ প্রতিবেদন, শান্তি-নিকেতন পত্রের ১৩২৮ মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত পূর্বোক্ত বিবরণ হইতে পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইল।

৪-সংখ্যক রচনাটি 'আলোচনা : বিশ্বভারতীর কথা' নামে ১৩২৯ ভাদ্র ও আশ্বিন সংখ্যা শান্তি-নিকেতন পত্রে প্রকাশিত হয়— 'গত ২০শে ফাল্গুন বিশ্বভারতীর কয়েকটি নবাগত ছাত্র আচার্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট বিশ্বভারতীর আদর্শ সম্বন্ধে কিছু শুনিতে চাহিলে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহার মর্ম।' আলোচনার শেষে রবীন্দ্রনাথ বলেন—

'আমি চাই, তোমরা বিশ্বভারতীর নূতন ছাত্রেরা খুব উৎসাহ ও আনন্দের সঙ্গে এখানকার আদর্শকে সমর্থন করে কাজ করে যাবে, যাতে আমি তোমাদের সহযোগিতা লাভ করি। আমার অনুরোধ যে, তোমরা এখানকার তপস্যাকে শ্রদ্ধা করে চলবে, যাতে এই প্রাণ-দিয়ে-গ'ড়ে-তোলা প্রতিষ্ঠানটি অশ্রদ্ধার আঘাতে ভেঙে না পড়ে।'

গ্রন্থপরিচয়

'বিশ্বভারতীর আদর্শ-প্রচার-কল্পে কলিকাতায় বিশ্বভারতী সম্মিলনী নামে যে-একটি সভা স্থাপিত হয়', ১৩২৯ সালে তাহার একটি অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর আদর্শ ব্যাখ্যা করেন, ৫-সংখ্যক রচনা সেই বক্তৃতার অনুলিপি ; 'বিশ্বভারতী সম্মিলনী : লেডি-সাহেবের বিদায়-সম্বর্ধনার পরে আলোচনাসভা' এই নামে ইহা শান্তিনিকেতন পত্রের ১৩২৯ পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

১৯২২ সালের ২১ অগস্ট্ রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে ছাত্রসভায় বিশ্বভারতী সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দেন, ৬-সংখ্যক রচনা তাহার অনুলিপি। Presidency College Magazine-এ (Vol IX, No I, September 1922) তাহা 'বিশ্বভারতী' নামে প্রকাশিত হয়। ঐ সংখ্যায় Welcome, Rabindranath শীর্ষক রচনায় এই বক্তৃতার আনুষঙ্গিক বিবরণ মুদ্রিত আছে।

৭-সংখ্যক রচনা, ১৩৩০ সালের নববর্ষে শান্তি-নিকেতন মন্দিরে নববর্ষের উৎসবে আচার্যের উপদেশ ; ১৩৩০ ভাদ্র সংখ্যা শান্তিনিকেতন পত্রে 'নববর্ষে মন্দিরের উপদেশ' আখ্যায় প্রকাশিত হয়।

৮-সংখ্যক প্রবন্ধ শান্তিনিকেতন মন্দিরে ৫ বৈশাখ ১৩৩০ তারিখে কথিত আচার্যের উপদেশের অনু-লিপি— শান্তিনিকেতন পত্রের ১৩৩০ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এই রচনাটি প্রবাসীর ১৩৩০ মাঘ সংখ্যায় কষ্টিপাথর-বিভাগে 'তীর্থ' নামে অংশতঃ মুদ্রিত হয়।

৯-সংখ্যক রচনা 'বিশ্বভারতী' নামে ১৩৩০ পৌষ সংখ্যা শান্তিনিকেতন পত্রে প্রকাশিত হয়।

১৩৩০ সালে শান্তিনিকেতনে ৭ পৌষের উৎসবে রবীন্দ্রনাথ যে উপদেশ দেন তাহা এই গ্রন্থের ১০-সংখ্যক প্রবন্ধরূপে প্রকাশিত হইল। প্রথমে উহা শান্তিনিকেতন পত্রের ১৩৩০ মাঘ সংখ্যায় '৭ই পৌষ : দ্বিতীয় ব্যাখ্যান' আখ্যায় মুদ্রিত হয়।

১১-সংখ্যক রচনা 'দক্ষিণ আমেরিকা যাইবার জন্য কলিকাতায় আসিবার পূর্ব-রাত্রে (১৭ ভাদ্র ১৩৩১) শান্তিনিকেতন আশ্রমে কথিত' 'যাত্রার পূর্বকথা' নামে ১৩৩১ কার্তিক সংখ্যা প্রবাসীতে মুদ্রিত হয়।

১৩৩২ সালের ৯ পৌষ শান্তিনিকেতনে বিশ্ব-ভারতী পরিষদের বার্ষিক সভায় রবীন্দ্রনাথ যে বক্তৃতা

দিয়াছিলেন ১২-সংখ্যক রচনা তাহার অনুলিপি। ১৩৩২ ফাল্গুন সংখ্যা শান্তিনিকেতন পত্রের ক্রোড়-পত্ররূপে, পরে স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে ইহা প্রচারিত হয়।

১৩-সংখ্যক রচনা ১৩৩৩ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা ভারতী-পত্রে প্রকাশিত ও ১৩৩৩ শ্রাবণ সংখ্যা প্রবাসীতে কষ্টিপাথর-বিভাগে ('ভিক্ষা') উদ্ধৃত।

১৪-সংখ্যক রচনা একটি আলোচনার অনুলিপি ; প্রথমে ১৩৩৭ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা বিচিত্রায় 'কর্মের স্থায়িত্ব' নামে প্রকাশিত।

১৩৩৯ সালের ৯ পৌষ শান্তিনিকেতনে বিশ্ব-ভারতীর বার্ষিক পরিষদ্-সভায় রবীন্দ্রনাথের অভি-ভাষণ ১৫-সংখ্যক প্রবন্ধরূপে মুদ্রিত হইল। ইহা প্রথমে Visva-Bharati News -এর January 1933 Paush Utsav Number-এ 'আচার্যদেবের অভিভাষণ' আখ্যায় প্রকাশিত হয়।

১৩৪১ সালের ৮ পৌষ শান্তিনিকেতনে বিশ্ব-ভারতীর বার্ষিক পরিষদ্-সভায় আচার্যের অভিভাষণ বর্তমান গ্রন্থের ষোড়শ প্রবন্ধ। ইহা পূর্বে ১৩৪১

ফাল্গুন সংখ্যা প্রবাসী পত্রে 'ধারাবাহী' প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশ রূপে প্রকাশিত।

বিশ্বভারতীর বার্ষিক পরিষদে ১৩৪২ সালের ৮ পৌষ তারিখে রবীন্দ্রনাথ যে বক্তৃতা দেন তাহা এই গ্রন্থের সপ্তদশ রচনা। এই বক্তৃতার অন্য একটি অনুলিপি 'বিশ্বভারতী বিদ্যায়তন' নামে বিশ্বভারতী পত্রিকার ১৩৪৯ ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

১৮-সংখ্যক রচনা, ১৩৪৫ সালের ৮ পৌষ তারিখে শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর বার্ষিক পরিষদে প্রতিষ্ঠাতা-আচার্যের অভিভাষণ— পূর্বে ১৩৪৫ মাঘ সংখ্যা প্রবাসীতে 'বিশ্বভারতী' নামে মুদ্রিত হইয়াছিল।

১৩৪৭ সালের ৮ শ্রাবণ তারিখে শান্তিনিকেতন মন্দিরে সাপ্তাহিক উপাসনায় রবীন্দ্রনাথ যে উপদেশ দেন, এই গ্রন্থের ঊনবিংশ রচনা তাহার অনুলিপি ; ইহা ১৩৪৭ ভাদ্র সংখ্যা প্রবাসীতে 'আশ্রমের আদর্শ' নামে প্রকাশিত।

বিজ্ঞপ্তি

এই গ্রন্থে সংকলিত অভিভাষণগুলি বক্তৃতার তারিখ অনুযায়ী নিবিষ্ট হইয়াছে। যে ক্ষেত্রে সে তারিখ পাওয়া যায় নাই সে ক্ষেত্রে প্রকাশের তারিখ অনুযায়ী সাজানো হইয়াছে, রচনা-শেষে তারিখটি 'প্র' চিহ্নিত। ৫ সংখ্যক বক্তৃতার তারিখ, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩২৯ সংখ্যা শান্তিনিকেতন পত্রে 'আশ্রম-সংবাদে' প্রকাশিত সিলভ্যাঁ লেভি-সম্পর্কিত বিবরণ হইতে অনুমিত।

গ্রন্থপরিচয়ে বিশ্বভারতীর সূচনা কার্যারম্ভ প্রভৃতি সংক্রান্ত যে-সকল তারিখ ও বিবরণ উদ্ধৃত হইয়াছে সেগুলি শান্তিনিকেতন পত্রে প্রকাশিত বিশ্বভারতী বার্ষিক প্রতিবেদন, ও অন্যান্য বিবরণী হইতে গৃহীত।

গ্রন্থপরিচয়ে উল্লিখিত হইয়াছে যে, এই গ্রন্থের অধিকাংশ রচনাই রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার অনুলিপি। তন্মধ্যে ৬, ১০, ১৫, ১৮ শ্রীপ্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্ত -কর্তৃক; ১৬, ১৭ শ্রীপুলিনবিহারী সেন -কর্তৃক; ১২ শ্রীইন্দ্রকুমার চৌধুরী -কর্তৃক; ১৪ শ্রীঅমিয় চক্রবর্তী -কর্তৃক; ১৯ শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় -কর্তৃক অনুলিখিত। সাময়িক পত্রে বা অন্যত্র এই-সকল উল্লেখ

দেখা যায়। এই অনুলিপিসমূহের অনেকগুলি, বক্তা -কর্তৃক সংশোধিত ও অনুমোদিত, সাময়িক পত্রে এইরূপ উল্লেখ আছে।

এই গ্রন্থে প্রকাশিত সিলভ্যাঁ লেভি ও রবীন্দ্র-নাথের চিত্র শ্রীশান্তিদেব ঘোষের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

১৩৫৮

চিত্রসূচী